প্রথম অধ্যায়

প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবন ও সাহিত্য

উত্তর রবীন্দ্রযুগের অন্যতম প্রতিভাধর সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম উত্তর প্রদেশের কাশীতে। হুগলি জেলার কোন্নগর গ্রামের এক সুশিক্ষিত, অভিজাত-বংশীয় ও প্রতিপত্তিশালী মিত্র পরিবারের সন্তান প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের পিতামহ শ্রীনাথ মিত্র ছিলেন ব্রাহ্মধর্মীয় সুশিক্ষিত মানুষ। শ্রীনাথ মিত্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন মনীষী শিবনাথ শাস্ত্রী। সমকাল ও ব্রাহ্মধর্ম-বিষয়ক পড়াশোনার আবহ মিত্র-পরিবারে প্রথম থেকেই ছিল। এছাড়াও ছিল উদার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। শ্রীনাথ মিত্রের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। ভাগলপুরে রেলের অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদে তিনি কর্মরত ছিলেন। রেলের চিকিৎসক হিসেবে খ্যাত রাধারমণ ঘোষের একমাত্র কন্যা সুহাসিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয় জ্ঞানেন্দ্রনাথের। সুহাসিনী দেবী এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথের পুত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম হয় কাশীর মাতুলালয়ে — রাধারমণ ঘোষের গৃহে। কিন্তু, প্রেমেন্দ্রের জন্মের পর জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রথমা স্ত্রীর বর্তমানেই আবার বিবাহ করলে সুহাসিনী পুত্রসহ পিত্রালয়ে চলে আসেন। অনেকেরই ধারণা প্রেমেন্দ্র মিত্রের নামকরণে জ্ঞানেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম হরিসুন্দর বসুর পুত্র প্রেমসুন্দর বসুর নাম সাদৃশ্য ও প্রভাব আছে। কিন্তু, এই ধারণার কোন প্রমাণ বা তথ্য নেই। প্রবোধকুমার সান্যাল তাঁর 'বনস্পতির বৈঠক' নামক স্মৃতিকথামূলক প্রবন্ধের সমালোচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে বলেছিলেন যে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রকৃত নাম 'প্রেমেন্দ্র হরি'। বিষয়টিতে তীব্র আপত্তি জানিয়ে প্রেমেন্দ্র 'দেশ'

পত্রিকায় ১৩৮০ বঙ্গাব্দে, বৈশাখ সংখ্যায় লিখেছিলেন যে, তাঁর নাম প্রেমেন্দ্র হরি নয়। এবং আরও জানিয়েছিলেন যে প্রায় পাঁচ দশক আগে 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'শুধু কেরাণী' তে লেখক হিসেবে তাঁর নাম যা মুদ্রিত ছিল, আজ পর্যন্ত সেই প্রেমেন্দ্র মিত্র নামেই তিনি পরিচিত। (সূত্র গ্রহণ ঃ প্রেমেন্দ্রে মিত্র ঃ সুমিতা চক্রবর্তী) শুধুই নাম নয়, বিতর্ক আছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম-সময় ও জন্ম-সাল নিয়েও। প্রেমেন্দ্রের জন্মসাল হিসেবে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ প্রচলিত। 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশিত 'প্রেমেন্দ্র মিত্র শতবার্ষিকী সংকলন', গ্রন্থে সম্পাদক সুরজিৎ দাশগুপ্ত লিখেছেন, '১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর বারাণসীর হরিশচন্দ্র ঘাটের কাছে আউদঘরবি মহল্লাতে দাদামশায় রাধারমণ ঘোষের বাড়িতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম' (ঐ)। অন্যদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যের সমালোচক ডঃ রামরঞ্জন রায় তাঁর 'প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ কবি ও ঔপন্যাসিক' বইটিতে জানিয়েছেন '১৯০৪ সালে (ভাদ্র মাস, মঙ্গলবার) তাঁর জন্ম কাশীতে।'(ঐ) এ বিষয়ে একটি ভিন্নসুর যোগ করেছেন প্রখ্যাত সমালোচক অধ্যাপিকা ডঃ সুমিতা চক্রবর্তী। অধ্যাপিকা চক্রবর্তী যে তথ্য দিয়েছেন তা মোটামুটি এইরকম যে, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ৯জুন 'ক্যালকাটা গেজেট' -এ সে বছরের প্রবেশিকা উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণদের মধ্যে ছিল। ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট অনুসারে তখন তাঁর বয়স ছিল ষোল বছর ছয় মাস। সেক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্রের জন্ম-সময় হওয়া উচিত ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষার সময়সীমা ষোল বছর হলে, ১৯০৪ এর মার্চ মাস থেকে ছয় মাস পিছিয়ে গেলে জন্ম সময়কাল দাঁড়ায় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। প্রসঙ্গত প্রেমেন্দ্র নিজেও তাঁর জন্মসাল সম্পর্কে ভাদ্রমাসের কথা জানিয়েছিলেন। ইংরাজি সেপ্টেম্বরই নামান্তরে বাংলা ভাদ্র মাস, বলা বাহুল্য। অন্যদিকে, প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর আত্মকথা 'নানা রঙে বোনা' য় জানিয়েছেন যে, তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারেননি সঠিক সময়ে জন্মপত্রিকা দাখিল করার অভাবে। তাই একই ক্লাসে তিনি তিনবছর কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুতরাং, সমস্ত তথ্যপ্রমাণ মিলিয়ে ডঃ সুমিতা চক্রবর্তীর মতটিই গ্রহণযোগ্য মনে হয়। অর্থাৎ প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে এই মতটিই যুক্তিসঙ্গত। প্রেমেন্দ্রের জন্ম তারিখ ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহে অর্থাৎ আগস্ট মাসের ৩ থেকে ৫ তারিখের মধ্যে হওয়াই সম্ভব। প্রেমেন্দ্র নিজে ভ্রান্তিবশতঃ ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে জন্ম বলে উল্লেখ

করলেও তারিখ হিসেবে ৩, ৪, ৫ এর কথাই বলেছেন। প্রেমেন্দ্র কথিত ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ এক্ষেত্রে গৃহীত হল না, কারণ প্রেমেন্দ্র নিজেও এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না, এবং তাঁর অস্থির স্বভাবের জন্য তিনি সঠিক তথ্য নিজের লেখাবিষয়েও দিতে পারেন নি, জন্মসময় বিষয়েও নয়।

অতি শৈশবের কাশী থেকে প্রেমেন্দ্র তাঁর মায়ের সঙ্গে চলে এসেছিলেন উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে। দাদামশায় রাধারমণ ঘোষ সেখানে ছিলেন রেল হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক। এসময়ের কথা প্রেমেন্দ্র লিখেছেন তাঁর স্মৃতিকথা - 'নানা রঙে বোনা' য়। সেখানে লিখেছেন 'কাঁটাতার ঘেরা রেলচত্বর' ও শৈশবের দুই সঙ্গী লজ্জু ও মুরাদের কথা। তখন কাঁটাতারের বাইরের পৃথিবী এবং দুটি সঙ্গী সমান আকর্ষণীয় ছিল প্রেমেন্দ্রর কাছে। নির্জন প্রান্তর, রেলস্টেশন, ট্রেনের যাওয়া -আসা, দূরের সিগন্যাল— সবমিলিয়ে শিশুমনে যেন কবি-কল্পনার আসনটি গড়ে তুলেছিল। এই সঙ্গে ছিল লজ্জু আর মুরাদ। 'লজ্জু' নামক মেয়েটি বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে প্রেমেন্দ্রকে 'কল্পনার ব্যবহার' শিখিয়েছিল। লজ্জুর দুরন্ত কল্পনার সামনে বালক প্রেমেন্দ্রের মুগ্ধতা তাঁর ভাবনাক্ষেত্রকে বিস্তৃতি দিয়েছিল। পরবর্তীকালের মননঋদ্ধ একজন শিল্পীর পক্ষে স্বভাবতই রেল কোম্পানির কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যেকার নির্জনতা এবং বাইরের উন্মুক্ত প্রকৃতির আহ্বান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অনেক সমালোচক বিশেষতঃ প্রেমেন্দ্রর কবিসত্ত্বায় 'পথিক সত্ত্বা' ও গৃহী মানবসত্ত্বার দ্বন্দ্বময়তা খুঁজে পান। আমাদের মনে হয়, শৈশবে এই দুই বিপরীত স্মৃতিই প্রেমেন্দ্রের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, যা সাহিত্যিক হিসেবে তিনি কখনই বিস্মৃত হতে পারেননি। এই প্রভাবের কথা প্রেমেন্দ্র নিজেও স্বীকার করেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়। তাঁর কল্পনা ও বোধকে অবশ্যই জাগিয়ে তুলেছিল ছোটবেলা থেকেই বিচিত্র ও বিস্তৃত পড়াশোনার অভ্যাস। পরবর্তীকালে তাঁর যে বিচিত্র প্রতিভা সকলকে বিস্মিত করেছে তার মূলে রয়েছে নানাধরনের বই পড়ার অভ্যাস। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটবেলায় এই অভ্যাস গড়ে দিয়েছিলেন তাঁর মা সুহাসিনী দেবী। সুহাসিনী দেবীর নিজেরও যে শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল এবং তিনি যে মননশীল ও শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন তার প্রমাণ হিসেবে প্রেমেন্দ্র লিখেছেন স্মৃতিকথায় যে, তিনি মায়ের হাতে দেখেছিলেন 'ভারত মহিলা' পত্রিকা, যেখানে নিজে তিনি পড়ে ফেলেছিলেন পিয়ের লোতির রচনার অনুবাদ।

পুত্রের শিক্ষায় স্বভাবতই যত্নশীল ছিলেন সুহাসিনী দেবী। প্রেমেন্দ্র নিজেই বিবরণ দিয়েছেন

— কী কী পাঠ করেছিলেন তিনি। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ 'বোধোদয়' দ্রুত শেষ করেছিলেন প্রেমেন্দ্র। পড়ে ফেলেছিলেন প্যারীচরণ সরকারের ফার্স্ট বুক এবং হিন্দী। পড়ার বইয়ের বাইরেও যে কোন বই নির্বিচারে পড়ে ফেলতেন প্রেমেন্দ্র। এভাবেই তিনি অল্পবয়সেই পড়ে ফেলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী', ফ্রেডেরিক ম্যারিয়াট -এর 'মাস্টারম্যান রেডি', অমৃতলাল গুপ্তের 'যতীন্দ্র - যামিনী', রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প প্রভৃতি। এর মধ্যে কোনটির রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, কোনটির কারুণ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভিজ্ঞতায় স্থায়ী হয়েছিল। সেগুলিও পরোক্ষভাবে সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্রকে নানাভাবে প্রাণিত করেছে আশা করা যায়। এছাড়াও ছেলেবেলাতেই প্রেমেন্দ্র মায়ের মুখে শুনেছিলেন দেশের জন্য আত্মবলিদানের কাহিনি। বড়দের বইও পড়েছেন এসময়, নিজেই তা লিখেছেন আত্মজীবনীতে। অন্যদিকে নিজেই বলেছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ছোটদের বইয়ের একটি কবিতার কথা — যেখানে কাহিনী কাব্যে বোনের মৃত্যুর পর ভাইয়ের শোক অভিভূত করেছিল প্রেমেন্দ্রকে। এই ধরনের 'রোমান্টিক বিষাদ' সাহিত্যিক মাত্রেরই অবলম্বন, প্রেমেন্দ্র মিত্রকেও এই বিষাদ আচ্ছন্ন করেছিল। প্রেমেন্দ্রের কবিতায় এই বিষাদ তাঁর কাব্য বৈশিষ্ট্য তো বটেই, সাহিত্যজীবনের অন্যতম ভাব বৈশিষ্ট্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। বন্ধু অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে লেখা একাধিক চিঠিতে অল্পবয়সী প্রেমেন্দ্রের এই রোমান্টিক আকুলতা ধরা পড়েছে — 'ভালো লাগে না — সত্যি ভালো লাগে না, বন্ধুর প্রেমে আনন্দ নেই, নারীর মুখেও আনন্দ নেই, নিখিল বিশ্বে প্রাণের সমারোহ চলছে তাতেও পাই না কোন আনন্দ।' (সূত্র ঃ পৃঃ ১২, কল্লোল যুগ)। অল্পবয়সে পড়া 'যতীন্দ্র - যামিনী'র স্মরণীয় অভিজ্ঞতা তাঁকে মর্মস্পর্শী সাহিত্য রচনায় সাহায্য করেছে । তবে, পড়াশোনার বাইরেও ছিল প্রকৃতির দুর্নিবার আকর্ষণ — একদিকে নির্জন প্রান্তরের মধ্যে নির্জন রেলষ্টেশন, অন্যদিকে কাঁটাতারে ঘেরা কম্পাউণ্ড, বন্ধন ও মুক্তির আকর্ষণ - সম্ভবত প্রেমেন্দ্রের কবিসত্ত্বায় গৃহী ও প্রেমিক সত্ত্বার দ্বন্দ্ব নির্মাণ করেছিল। প্রেমেন্দ্র নিজেই তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন 'কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা সেই বিস্তীর্ণ এলাকা একদিকে যেন রূপকথা, আর একদিকে অতিবাস্তব জগৎ' (পৃঃ ২৭২, নানা রঙে বোনা, প্রেমেন্দ্র শতবার্ষিকী সংকলন, সম্পাদনা সুরজিৎ দাশগুপ্ত)। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় রেল লাইন, চলে যাওয়া ট্রেন, সিগন্যাল, নির্জন স্টেশন কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যেত প্রেমেন্দ্রকে । আর 'রূপকথার রাজ্যের সঙ্গী ছিল' লজ্জু আর

মুরাদ। প্রেমেন্দ্র লিখেছেন, 'রোমাঞ্চ উত্তেজনার ব্যাপারে হাসপাতাল কম্পাউণ্ডেরই নাতিবৃহৎ একটি বেড়া দেওয়া বাগানই আমাদের কাছে অজানার রাজ্য হয়ে উঠলেও মনকে দুর্গম দুঃসাধ্যের জন্যে উৎসুক করার খোরাক তাতে কিছু কম মেলেনি।' (পৃঃ ২৭২, ঐ) । লজ্জু-মুরাদের সঙ্গে বনে জঙ্গলে বেড়িয়ে দিন কাটত প্রেমেন্দ্রের। লেখক জানিয়েছেন যে প্রথম বানিয়ে গল্প রচনা তিনি শিখেছিলেন লজ্জুর কাছে। 'টেপারি' খাবার লোভে জঙ্গলে গিয়ে তাদের সকলেরই কমবেশী হাত পা কেটেছিল আর লজ্জুর পাজামাটা ছিঁড়েছিল বেশ কিছুটা। লজ্জু প্রথমে বলেছিল 'বাঁদর ছিঁড়ে দিয়েছে', পরে আরও 'জমকালো কৈফিয়ৎ' তৈরী করেছিল। বলেছিল 'দুষমন ডাকু' তাকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল ঘোড়ায় চড়িয়ে, সে ডাকুকে আঁচড়ে কামড়ে আসতে গিয়েই তার এ অবস্থা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম শৈশবে লজ্জুই তাকে প্রথম 'বানিয়ে গল্প' বলার প্রথম পাঠ দিয়েছে (ঐ)। এবং এরপর থেকে লেখক লজ্জুকে নতুন চোখে 'ভয় ও ভক্তিতে' দেখেছিলেন (ঐ)। লজ্জু ও মুরাদ এর পাশাপশি যিনি প্রেমেন্দ্রের ব্যক্তিত্বে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তিনি প্রেমেন্দ্রের মাতামহ ডঃ রাধারমণ ঘোষ। প্রেমেন্দ্রের আত্মজীবনীতে তিনি প্রায়ই 'বাবু' , 'বাবা' প্রভৃতি আখ্যায় সম্বোধিত। অল্প বয়সে এই মাতামহ এবং মাতামহী, তাঁরাও অনেকাংশে গড়ে দিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্রের মানস বৈশিষ্ট্য। বিশেষতঃ মাতামহের মধ্যে দরদী চিকিৎসকের যে বৈশিষ্ট্য ছিল, প্রেমেন্দ্রকে তা আদর্শায়িত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। মাতামহের সুচিন্তিত মতামত, দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা, শিক্ষা সবই তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। এ সময়ের একটি অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে প্রেমেন্দ্র লিখেছেন যে, সাপের বিষের ঔষুধ এবং শিকড় এ দুয়ের লড়াই এ চিকিৎসা বিজ্ঞানকে জয়ী করেন তাঁর দাদামশাই। এ সময়ই প্রেমেন্দ্রের জীবনে আসেন 'পাড়াগেঁয়ে তুলসীমামা'। তুলসী মামার প্রবেশ ও প্রস্থান ছিল আকস্মিক। লেখক জানিয়েছেন, তুলসীমামার হঠাৎ চলে যাওয়া কিশোর মনে খুব বেশী প্রভাব ফেলেনি। কিন্তু তার প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী, তিনি কিশোর মনের সামনে একটি অদেখা দরজা খুলে দিয়েছিলেন, যে দরজা ছিল 'আশ্চর্য বইয়ের জগৎ'। বিবিধ বই সম্পর্কে কিশোর মনের আকাঙ্খা সেখানে প্রশ্রয় পেয়েছিল যা পরবর্তীকালেও সদা জাগ্রত ছিল, এবং সর্বোপরি অনেক বেশী পড়ার আগ্রহ যা ভালো সাহিত্যিকের গুণাবলি। প্রেমেন্দ্রকে তাও প্রেরণা দিয়েছিল বলা বাহুল্য। প্রেমেন্দ্রের ভাষায় 'ওই বয়সেই তুলসীমামার মধ্যে

বড় করে দেখা, আর বড় করে ভাবার মত একটা কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যার ছোঁয়ায় নিজের অগোচরে মনের একটা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।' (পৃঃ ঐ, নানা রঙে বোনা) তুলসীমামার উপস্থিতি শিশু মনে বর্হিজগৎ সম্পর্কে যুগপৎ কৌতূহল ও নতুন অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল। এছাড়া মাতামহ রাধারমণ ঘোষের সাহচর্যে প্রেমেন্দ্র তখন ঘুরে এসেছেন ফিরিঙ্গীদের অন্দরমহল। দেখেছেন এখানেই কোন এক সমাবেশে 'নির্বাক বায়োস্কোপ'; মুগ্ধ হয়েছেন সেখানে চলন্ত ঘোড়সওয়ার আর নৌ-চালনার দৃশ্য দেখে। পরবর্তীকালে যে প্রেমেন্দ্র প্রয়োগ শিল্প, তথা সিনেমা মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, হয়ে উঠবেন অন্যতম পুরোধাপুরুষ, তাঁর শৈশবেই এই আগ্রহ ও মুগ্ধতার সূত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রেমেন্দ্রের অধিকাংশ গল্পে আমরা লক্ষ করি যুক্তিবাদ ও রহস্যকে প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলেন প্রেমেন্দ্র। উল্লেখ করার মত যে এই সূত্রটিও প্রেমেন্দ্রের মনে গেঁথে গিয়েছিল মির্জাপুরে, তার শৈশবেই। একটি 'দৈব শিকড়' যা সাপের ওষুধ, তা ছিল মাতামহের কাছে, কিন্তু এই বিষয়টি প্রেমেন্দ্রের নিজের কাছেই অজ্ঞাত রয়ে গেছে। ফলে তা হয়ে উঠেছে 'রহস্যময়' ও অনাবিষ্কৃত। তাঁর ছোটগল্পেও অনেক সময় মন্ত্রগুপ্তি হয়ে উঠেছে গল্পটির আকর্ষণ। এর মূল রয়ে গেছে মির্জাপুরেই। এই সময়েই প্রেমেন্দ্র লক্ষ করেছেন রেল কম্পাউণ্ডের কাঁটাতারের বেড়ার বাইরের জগৎ, 'শহরের ঘিঞ্জি এলাকায় ওদেশী ধরনের মেলানো মোকানের ওপরতলা থেকে নীচের তলার কামরা ঘেরা বাঁধানো উঠোনের জীবন দেখার কিছু ছবি এখনও মনের মধ্যে আছে'। (পৃঃ ২৭৪, 'নানা রঙে বোনা') এছাড়াও ছিল খেটে খাওয়া মানুষদের 'বিপদ', 'হইহল্লা', 'ঝগড়া' প্রভৃতি দেখা — যা তাঁকে পরবর্তীকালে অনেক ছোটগল্পের বিষয় নির্বাচনে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়বে প্রেমেন্দ্র লিখিত 'মোট বারো', 'কল্পনায়' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলির কথা। এর সঙ্গে 'শেঠের বাগানবাড়ির অভিজ্ঞতা কিন্তু একেবারে আলাদা' (ঐ)। প্রেমেন্দ্রের অসুস্থ মাতামহকে সঙ্গে নিয়ে দিদিমা ওরফে 'ঠাটু' আশ্রয় পেয়েছিলেন গালার ব্যবসায়ী এই শেঠের বাড়িতে। এই বাড়িতে 'বাবু' অর্থাৎ মাতামহ রাধারমণ ঘোষ মারা যান। আর শিশু প্রেমেন্দ্র ঐ বয়সেই অগাধ ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্য দেখে বুঝে যান 'এ একটা আলাদা জগৎ যার সঙ্গে আমাদের সত্যি করে সম্পর্ক নেই।' (পৃঃ ঐ)। কিন্তু বিস্তীর্ণ 'বাগানবাড়ির অভিজ্ঞতা ও অপ্রত্যাশিত বেড়ানোর স্বাধীনতা' (ঐ)। প্রেমেন্দ্রকে অন্য এক পৃথিবীর সামনে দাঁড় করিয়েছিল। তাঁর অনেক গল্পে

জমিদার বংশ ও পড়তি জমিদারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, প্রেমেন্দ্রের মনে তখন এগুলিই প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। মির্জাপুরে বসবাস সমাপ্ত হয়েছিল মাতামহ রাধারমণ ঘোষের সংক্রামক রোগে মৃত্যুতে। চিকিৎসক রাধারমণ ঘোষ মহামারি বসন্ত রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এরপর দিদিমা কুসুমকুমারীও এই রোগে আক্রান্ত হন। পরে এক বৃদ্ধা দাই - এর সেকেলে পদ্ধতির চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হন।

সম্ভবত ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মাতা সুহাসিনী এবং দিদিমা কুসুমকুমারী দেবীর সঙ্গে প্রেমেন্দ্র আসেন বীরভূমের নলহাটিতে। তখন প্রেমেন্দ্রের বয়স ছয় কিংবা সাত। নলহাটি, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের একটি ছোট স্টেশন ছিল। কুসুমকুমারীর ভ্রাতা কালিপদ সেন ছিলেন নলহাটির হেড সিগনালার। সেখানেই এসে ওঠেন তাঁরা। প্রেমেন্দ্র এই পরিবর্তনের সময়ের উল্লেখ করে লিখেছেন — 'মির্জাপুর থেকে নলহাটির জন্য রওনা হওয়ার যে স্মৃতিটুকু এখনও আছে তাতে ট্রেনে চড়ে অজানা নতুন জায়গায় যাওয়ার উত্তেজনার সঙ্গে একটা কী যেন হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ মেশানো ছিল বলে এখনও মনে পড়ে।' (পৃঃ ২৭৬, নানা রঙে বোনা)। তাঁর সাথে নলহাটি এবং পরবর্তীকালে কলকাতায় পর্যন্ত রেলপথে বাহিত হয়ে এসেছিল একটি পাথরের চাঁই,' কারণ এর সাথে মাতামহ 'বাবু' র স্মৃতি জড়িত ছিল। তাই পাথরটা আর 'নিরর্থক অনাবশ্যক' থাকে নি বলে উল্লেখ করেছেন প্রেমেন্দ্র। তবে নলহাটির রেল কলোনী ভালো লেগেছিল তাঁর। শুকিয়ে যাওয়া দীঘি, পাকুড় গাছ, ঝোপঝাড়, উইঢিপি প্রভৃতি তাঁকে নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছিল। সঙ্গী ছিলেন প্রায় সমবয়সী বীরুমামা—কালিপদ সেনের পুত্র বীরেন্দ্রনাথ সেন। বয়সে প্রেমেন্দ্রের চেয়ে মাত্র বছর খানেকের বড় এই বীরুমামার প্রভাব ছিল প্রেমেন্দ্রের উপর অত্যন্ত বেশী। 'নলহাটিতে মাইনর স্কুলে তাঁদের পড়াশোনা শুরু হয়। কিন্তু সেখানেও বীরুমামার রেষারেষি। নলহাটিতে এসে আমাদের প্রথম স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা হল। ... সে স্কুলে ভর্তির সময় পড়াশুনার অনুপাতে বীরুমামার জন্য অনেক নিচের ক্লাস নির্দ্দিষ্ট হতেই সে বেঁকে দাঁড়াল। আমার ওপর ক্লাসে পড়া সে মানবে না। অনেক বোঝানো - সোঝানোর পরও তাকে শান্ত করতে না পারায় আমাকেই শেষ পর্যন্ত তার ক্লাসেই ভর্তি হতে হল।' (পৃঃ ২৭৭, নানা রঙে বোনা)। কিন্তু, এসব সত্ত্বেও 'বীরুমামার' সঙ্গে প্রেমেন্দ্রের সখ্য ছিল, এবং বীরুমামার

আকর্ষণ ছিল তাঁর কাছে অপ্রতিরোধ্য। একমাত্র 'খামখেয়ালী জেদ' ছাড়া বীরুমামা ছিল এক 'মধুর চরিত্র'। বীরুমামার অদম্য প্রভাব পড়েছে প্রেমেন্দ্রের কৈশোর জীবনে। বীরুমামার সঙ্গে স্বভাবগত বৈপরীত্যই সম্ভবত বীরুমামার প্রতি প্রেমেন্দ্রের আকর্ষণের অন্যতম কারণ। প্রেমেন্দ্রের কৈশোর জীবনকে কৌতূহল, কল্পনায় এগিয়ে দিতে এই বীরমামার ভূমিকা অনেকটাই। বীরুমামা আর প্রেমেন্দ্র দু'জনে মিলে গড়ে তুলেছিলেন ছোট একটি চিড়িয়াখানা। বিজ্ঞানমনস্ক প্রেমেন্দ্রের বিজ্ঞান চেতনার এই-ই সূচনা বলা যেতে পারে। চিড়িয়াখানায় তারা সংগ্রহ করেছিলেন নানা ধরনের শিশি- বোতল- বোয়াম এবং তার ভেতরে নানা ধরনের কীটপতঙ্গ, বোলতা, ফড়িং প্রভৃতি। প্রেমেন্দ্রের প্রাণীবিদ্যায় আকর্ষণের সূত্রপাতও এই সময় থেকে। এই বিজ্ঞান চেতনা প্রেমেন্দ্রের লিখিত ছোটদের গল্প, ঘনাদার গল্প এবং বেশ কিছু কবিতায় ধরা পড়েছে (যেমন - 'অ্যামিবা', কিংবা 'ইলেকট্রনের তামাশা')। ঐ বয়সেই তিনি পিঁপড়েদের স্বাতন্ত্র্য, প্রজাতিগত পার্থক্য চিনতে শিখেছিলেন। পরবর্তিকালে কিশোরদের জন্য তাঁর লেখা 'পিঁপড়ে পুরাণ' এর অভিজ্ঞতাতেও কোথাও সম্ভবত নলহাটির ঐ প্রভাবও রয়ে গেছে। নলহাটিতেই প্রেমেন্দ্র দেখেছিলেন 'রামলীলা'র অভিনয়। এসময়ে তাঁরা নিজেরাই কাগজের মুখোশ বানিয়ে ঐ অভিনয় অনুকরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে আমরা দেখেছি যে প্রয়োগশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন প্রেমেন্দ্র, তাঁর ছেলেবেলাতেই তাঁর মধ্যে এই শিল্পের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করা গেছে। নলহাটির একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাও জানিয়েছেন প্রেমেন্দ্র। নলহাটি রেল ষ্টেশনে রেললাইনের উপর দিয়ে হাঁটা তাঁদের বিচিত্র একটি খেলা ছিল। এই খেলার সময় ষ্টেশন-গার্ডের ছেলের সঙ্গে প্রেমেন্দ্রের বিরোধ বাঁধে। এরপরেই শ্বেতাঙ্গ ছেলেটির পিতা এসে প্রেমেন্দ্রকে প্রহার করায় ছেলেমানুষি বিরোধ তীব্র বিদ্বেষের জন্ম দেয়। প্রেমেন্দ্র বুঝেছিলেন শুধুমাত্র ইংরেজ- এই অধিকার বলেই তারা অন্যায়ভাবে পীড়ন করেছিল তাঁকে। এই অপমানবোধ, এই বেদনা পরবর্তী কলেজ জীবনেও কার্যকর ছিল। তাই, সম্ভবত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় দেশের স্বাধীনতার দাবিতে অনায়াসে কলেজ ত্যাগ করে সংগ্রামীদের সঙ্গে মিশে যেতে দ্বিধা হয়নি প্রেমেন্দ্রের। নলহাটিতেই 'বীরুমামা' তাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন 'বই লেখা'র। প্রেমেন্দ্র লিখেছেন সৃজনশীলতার প্রাথমিক পাঠ অনেকক্ষেত্রেই তিনি নিয়েছিলেন বীরুমামার কাছে, আর বই লেখার আনন্দ সবকিছুকে ছাপিয়ে

223032

31 MAR 2010

NBU, DARJEELING LIBRARY

গিয়েছিল — 'বীরুমামা অনেক বিষয়েই আমার নেতা, চিড়িয়াখানা পরিকল্পনার ব্যপারে যেমন, তেমনি ভাঙা থার্মোমিটারের খাপ জোগাড় করে তার মুখে সে কৌশলে নিব গুঁজে ফাউন্টেন পেন বানিয়ে সে আমাকে অবাক করে দিয়েছে। তার নতুন কীর্তিতে কিন্তু আগেকার সব বাহাদুরি ম্লান হয়ে গেল। একদিন খাতা কলম নিয়ে আমায় সে ডেকে বললে, 'আয় । আমরা বই লিখব।' ... বই যে লেখা যায়, আর মানুষেই লেখে এই ভাবনাটাই কখনও মাথায় আসেনি' (পৃঃ ২৮৭, নানারঙে বোনা)। বীরেন্দ্রনাথ সেনই অনেকাংশে প্রেমেন্দ্রের সাহিত্যপথের প্রথম প্রেরণা একথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। আবার সাহিত্যিক হিসেবে প্রেমেন্দ্রের অন্যতম উৎসাহদাতা ও তাঁর সমালোচকও বটে বীরেন্দ্রনাথ। 'প্রবাসী'তে প্রেমেন্দ্রের প্রথম ছোটগল্প 'শুধু কেরাণী' ছাপা হলে (তখন প্রেমেন্দ্র ছিলেন ঢাকায়) — সে সংবাদ জানিয়ে পত্রিকাটি সেখানে পাঠানোর দায়িত্ব নেন প্রেমেন্দ্রের বীরুমামাই। প্রসঙ্গত, কি বই লিখেছিলেন তাঁরা তা দেখা যাক। প্রেমেন্দ্র তাঁর লেখা সম্পর্কে যা বলেছেন তার শুরুটা ছিল 'কলিকাতা নগরীর নির্জন স্বল্পালোকিত একটি গলির জরাজীর্ণ একটি অট্টালিকার অন্ধকার একটি প্রকোষ্ঠে এক নিশীথে এই উপন্যাসের প্রধান দুই পাত্রপাত্রীর কথোপকথন' (পৃঃ ২৮৭, ঐ)। তাঁদের লেখার বিষয় ছিল। উল্লেখ করার মত প্রেমেন্দ্রের অধিকাংশ গল্পে ইচ্ছাকৃত রহস্যময় পরিবেশ, বর্ণন কৌশলে অতিপ্রাকৃত বাতাবরণ প্রভৃতি ছেলেবেলাতেই প্রেমেন্দ্রের মননে অনুস্যূত হয়েছিল। বীরেন্দ্রনাথ সেনের কৃতিত্ব এ বিষয়েও উল্লেখ করার মত।

নলহাটিতে থাকাকালীনই কুসুমকুমারী দেবী কোলকাতায় একটি বাড়ি কিনেছিলেন। সেই বাড়ি কিনে কন্যা ও দৌহিত্রসহ তিনি চলে আসেন ভবানীপুর। এখানেও সঙ্গী ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ। কিন্তু পাকাপাকিভাবে কোলকাতায় আসার আগের দুটি স্মরণীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন প্রেমেন্দ্র তার স্মৃতিকথায়। প্রথমটি হল নলহাটিতেই যাত্রা দেখার রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতা এবং দ্বিতীয়টি রামপুরহাট থেকে ট্রেনে কোলকাতা যাত্রা। দ্বিতীয় ঘটনাটি প্রেমেন্দ্রের পক্ষে ছিল যথেষ্ট উত্তেজনার। রামপুরহাটের একদল গোরা সওয়ার নলহাটির ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় পেপার এর খেলা খেলে চলে গিয়েছিল। সেই কাগজগুলির চিহ্ন ধরে প্রেমেন্দ্র ও বীরেন্দ্রনাথ অনেকদূর গিয়েছিলেন। কোলকাতায় যাওয়ার সময়েও তাঁরা এই বিষয়কে স্মরণে রেখে সঙ্গে নিয়েছিলেন দুটি বড় বড় থলে, যা কাগজকুচিতে

পরিপূর্ণ ছিল। এ জন্য তাদের অনেক অনুনয় বিনয় কান্নাকাটি ও করতে হয়েছিল। ট্রেনযাত্রায় কাগজকুচিগুলি মুঠো করে তারা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বাইরে, অথচ বারবার সেগুলি ভেতরে ঢুকে পড়ছিল। বীরেন্দ্রনাথের বাবা তাদের খাওয়ার সময় নিঃসারে থলেগুলি বাইরে ফেলে দিলে সে খেলা বন্ধ হয়েছিল। এই 'অ্যাডভেঞ্চার' -এর পরে ছিল কোলকাতা দেখার উত্তেজনা ও আনন্দ। প্রেমেন্দ্র লিখেছেন যে উনিশশো নয় অথবা দশ সালের সে কোলকাতার চেহারাই আলাদা। এবং বলেছেন 'অন্যের মুখে শুনে বা বই পড়ে এ কলকাতার বাইরের ছবি ও বিবরণ যতটাই পাওয়া যাক। সেকালে সেখানে বাস করার অনুভূতিটা সহজে আয়ত্ত্ব করবার নয়।' (পৃঃ ২৮৮, ঐ)। এর পাশাপাশি ছিল যাত্রাদেখার অভিজ্ঞতা। 'বীরুমামা' অসুস্থ হয়ে পড়ায় মূলত মার চোখে প্রেমেন্দ্রের অস্থিরতা ধরা পড়লে তার উদ্যোগে একাই যাত্রা দেখতে যান তিনি। এবং 'কল্পনায় মিথ্যে করে সাজানো একটা জগৎও চোখের ওপর একেবারে সত্য হয়ে উঠে সব কিছু যে ভুলিয়ে দিতে পারে, সে অভিজ্ঞতা জীবনে সেই প্রথম' (পৃঃ ২৯০, ঐ) প্রেমেন্দ্রর কবি কল্পনায় যে শৈশবের এই অভিজ্ঞতাগুলি অভিনবত্বের সন্ধান দিয়েছে তাও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। যাই হোক, এর পরে তাঁর কৈশোর পর্ব শুরু হল কোলকাতায়। ভবানীপুরে তাঁদের বাড়িটি ছিল রাস্তার শেষ প্রান্তে — 'দুখিনী রাস্তার সেকেলে একটা পুরনো একতলা বাড়ি।' (পৃঃ ২৯১, ঐ) পাশে প্রবাহিত শীর্ণকায় আদিগঙ্গা। সে বাড়িতে প্রেমেন্দ্ররা অনেকেই একসাথে থাকতেন ও স্কুল কলেজে পড়তেন। কোলকাতায় এসে সাউথ সুবার্বান স্কুলে সপ্তম শ্রেণী বা সেকালের ফোর্থ ক্লাসে ভর্তি হলেন প্রেমেন্দ্র ও বীরেন্দ্রনাথ। এই সময় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কিংবা মতান্তরে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রেমেন্দ্রের মা সুহাসিনি দেবী কালাজ্বর ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। প্রেমেন্দ্রের জীবনে মায়ের ভূমিকা যে কতখানি ছিল তার সামান্য ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি প্রেমেন্দ্রের শৈশব পাঠ্যাভ্যাসের প্রেরণায়। মাতৃহীনতার শোক অভিভূত করেছিল কিশোর প্রেমেন্দ্রকে। প্রেমেন্দ্রের কাছে সে শোক কেমন ছিল তা নিজেই জানিয়ে তিনি লিখেছেন — 'বেদনা হতাশা বিমূঢ়তা যা অনুভব করেছিলাম তা মনের এত গভীরে যে সব সময়ে স্পষ্ট করে টেরও পেতাম না। ... সূক্ষ্মতম আঘাত যেমন তার বাজে, তেমনি অতি নিদারুণ আঘাতে তা নিঃশব্দে নিজের মধ্যে তলিয়ে দিতেপারে।' (পৃঃ ২৯১, ঐ) মায়ের মৃত্যুর পর মাতামহীর গভীর স্নেহের আশ্রয় পেয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র।

তা সত্ত্বেও একদিন আদিগঙ্গার ঘাটে 'হাফ হলিডে' তে স্কুল ছুটি হবার পর একজনকে 'মার মত' ভেবে তার সঙ্গে 'অবুঝ আকূলতায়' বহুদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র। এসময় থেকেই প্রেমেন্দ্রর মনে অস্থিরতার জন্ম হয়। ঘরের বন্ধন এবং দূরের আকর্ষণে প্রেমেন্দ্রের কবিতা অনেকসময়ই দ্বন্দ্বময়, এর মূলে রয়ে গেছে এসময়ে প্রেমেন্দ্রের মানসিক আশ্রয়হীনতা ও অস্থিরচিত্ততার প্রভাব। এসময়ই একবার গুরুজনদের প্রতি অভিমানে ঘর ছেড়েছিলেন প্রেমেন্দ্র। ইংরেজী থেকে বাংলা অভিধান লেখার জন্য তিনি চেয়েছিলেন বালির কাগজের পরিবর্তে এক্সারসাইজ বুক। কিন্তু পরিবর্তে পেলেন ভর্ৎসনা। তাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরমানন্দে দু'দিন কাটিয়ে দিলেন হাওড়া স্টেশনে। এরপরে দূরপাল্লার ট্রেনেও উঠে বসেছিলেন। কিন্তু তারপরেই আদি গঙ্গার ধারের বাড়ি, স্কুল মাঠ সব তাকে আকর্ষণ করতে লাগল। এবং সেই প্রথম প্রেমেন্দ্র গভীরভাবে অনুভব করলেন — 'জাত বাউণ্ডুলে যাকে বলে তা আমি নই'। (পৃঃ ১৯৮, ঐ) এই অনুভূতির সত্য চিরকালই প্রেমেন্দ্রের সাহিত্যে বিশেষত কবিতায় বিশেষ ছাপ ফেলেছে। যেমন — 'হরিণ চিতা চিল' কাব্যগ্রন্থের 'নিরর্থক' কবিতাটি। যাহোক, প্রেমেন্দ্রকে হাওড়া ষ্টেশন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন 'তুলসীমামা'। তবে, প্রথমেই তিনি তাঁকে বাড়িতে তোলেন নি। বরং তাঁর 'নিখোঁজ হওয়াকে' গুরুতর করেছিলেন এমনভাবে যাতে প্রেমেন্দ্র 'বিজয়ীর সম্মান নিয়েই বাড়িতে নিজের দাবী আদায় করে'ই ঢুকতে পারেন। তবে, এই সময়ের আরও একটি পারিবারিক বিষয়ের কথাও প্রেমেন্দ্র উল্লেখ করেছেন। বলেছেন যে, অসংখ্য আত্মীয় একত্রে তাঁদের বাড়িতে একসাথে থাকতেন। তাই বাড়ি সবসময় সরগরম থাকত। কিন্তু থালাবাটিরও কখনও অকুলান 'হত। তাই বেশীরভাগ দিনই কলার পাতায় খাওয়া হত, আর একই কেরোসিনের লণ্ঠনে জনা তিনচারেকের ভাগ বসত। এতে অসুবিধা খুব বেশী না হলেও নিজের বই কাগজ রাখবার একটা বাক্স বা ড্রয়ারের জন্য আগ্রহ ছিল তাঁর ; বলেছেন — 'বহুকাল পরে আমার 'ভিড়' নামের একটি গল্পে এই আগ্রহ আর তা নিস্ফল হওয়ার করুণতা একটু বোধহয় ফোটাবার চেষ্টা করেছি।' (পৃঃ ২২৯, ঐ)। কিন্তু সেজন্য দুঃখ বিলাস করার অবসর তিনি পাননি। ইতিমধ্যে আর একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন প্রেমেন্দ্র, তা হল দিদিমার সঙ্গে গঙ্গাসাগর যাত্রা। প্রেমেন্দ্রের বয়স তখন বারো ই হওয়া উচিত, যদিও অসতর্কেই সম্ভবত স্মৃতিকথায় প্রেমেন্দ্র নিজের বয়স 'ন-দশ' বলে

উল্লেখ করেছেন। কারণ, প্রেমেন্দ্রের জন্মসময় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁরা কোলকাতায় এসেছেন তখনই তাঁর বয়স এগারো। গঙ্গাসাগরে যাওয়ার ঘটনা তার পরের বছর। যাই হোক, সেই যাত্রায় প্রেমেন্দ্র দেখেছিলেন বারবণিতাকে নৌকায় স্থান দেওয়া নিয়ে পাশের নৌকায় একদল লোকের কলহ এবং দেখেছিলেন দেহপোজীবিনীদের একটি বালিকাকে। রাতে হঠাৎ জোয়ার আসা, নৌকার যাত্রীদের ভীত চিৎকার প্রভৃতিও প্রেমেন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। এই বিষয়গুলিই পরবর্তীকালে অণুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত 'সাগরসঙ্গমে' গল্পটির কথা বিশেষভাবেই এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । এই গল্পে বিষয় হিসেবে কলেরা মহামারির কথা যুক্ত হয়েছে। এও প্রেমেন্দ্রের চোখে দেখা অভিজ্ঞতাই। আর একটি ঘটনাও এই যাত্রাকালে স্মরণীয়; সেটি হল পরিচিতা এক ব্রাহ্মণ রমণী স্নেহভরে প্রেমেন্দ্রকে ঐ যাত্রাকালে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু, তিনি কায়স্থ বলে তাঁকে খেতে দেওয়া হয় ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট পাতায়। সম্ভবত মহিলা সংস্কারবশেই একাজ করেছিলেন। কিন্তু প্রেমেন্দ্রের মন এতে তীব্র আঘাত পেয়েছিল। নিঃশব্দে তিনি চলে এসেছিলেন খাবার গ্রহণ না করেই। জাতিগত গোঁড়ামির উর্ধ্বে এবং মানবিকতার পক্ষে তখনই নিজেকে স্থাপন করেছিলেন প্রেমেন্দ্র।

কোলকাতায় ফিরে আসার পর ক্রমশ পাঠ অনুশীলনের পরিধি বিস্তৃত করেছিলেন প্রেমেন্দ্র। শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ ছিল না প্রেমেন্দ্রের পড়াশুনা। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় স্কুলের গ্রন্থাগার থেকে আনা বিভিন্ন বই পাঠ করে তাঁর আগ্রহ ও কৌতূহল ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। জুলেভার্নের লেখা ইংরাজী অনুবাদ 'টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগ্‌স্ আন্ডার দা সি' পড়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক কল্পকাহিনির ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। পরবর্তী জীবনে যে প্রেমেন্দ্র কল্পকাহিনির জনপ্রিয়তম রচনাকার হয়ে উঠবেন, লিখবেন 'মনুদ্বাদশ' এর মতো কল্প উপন্যাস, ঘনাদা সিরিজ এর অসংখ্য কল্পকাহিনি, প্রভৃতি তার পক্ষে এই আকর্ষণ স্বাভাবিকই ছিল। বাংলা ও ইংরাজী দুই ভাষার বই-ই নির্বিচারে পড়েছিলেন প্রেমেন্দ্র এ সময়ে। পড়েছিলেন চার্লস ডিকেন্স -এর 'অলিভার টুইস্ট', রবার্ট গ্রিন ইঙ্গরসল -এর লেখাও। আর শেষোক্তবইটি পড়ে ঈশ্বর সম্পর্কে সংশয়বাদী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। প্রেমেন্দ্র এই বইটির প্রভাব প্রসঙ্গে লিখেছেন 'তবু যেসব জীবনের ধারার কথা ভাবতে পেলে মোড় ঘোরাবার মতো যেসব বিশেষ ঘটনা আর বিস্ময়কর সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের কথা মনে পড়ে তার মধ্যে ফুটপাথের

ফেরিওয়ালার কাছে কেনা বই, পুরোনো বইটির ভূমিকা অন্য কিছুর তুলনায় যে সামান্য নয়, একথা স্বীকার না করে পারছি না।' (পৃঃ ৩০৩, নানা রঙে বোনা)। এর পাশাপাশি প্রেমেন্দ্র লিখেছিলেন বিপ্লবী আদীশ্বর ভট্টাচার্যের কথা। শিক্ষকতা এবং বিপ্লবচেতনার প্রসার এ দুই-ই সমানভাবে তাঁর ব্রত ছিল। ইঙ্গারসনল এর নাস্তিকতা এবং আদীশ্বর ভট্টাচার্যের বিপ্লবী ভাবনা সমানভাবে আলোড়িত করেছিল প্রেমেন্দ্রকে। প্রেমেন্দ্র সেই কৈশোরেই অনুভব করেছিলেন বড় হওয়ার জটিলতার কথা। সেই বিপ্লবী ভাব আন্দোলনের যুগে প্রেমেন্দ্র-মানসে দুই প্রভাব তার সাহিত্যজীবনের উপরেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইতিমধ্যে প্রেমেন্দ্র দেখেছিলেন তাঁদের ক্লাসের একটি ছেলে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে, যার কাছে পাওয়া গেছে রিভলভার ইত্যাদি। ছেলেটির নাম গোপালকৃষ্ণ বেরা। প্রেমেন্দ্র তাঁর সহপাঠী ছিলেন। গোপাল বেরার দৃপ্ত কাঠিন্য প্রেমেন্দ্রকে অভিভূত ও মুগ্ধ করেছিল। বিদ্যালয় স্মৃতি প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র স্মরণ করেছেন তার শিক্ষক ও সহপাঠিদের কথা। গোপাল বেরার সঙ্গে কবিতা লেখার প্রতিযোগিতায় প্রেমেন্দ্র কৌতুক করেই তাঁকে শুনিয়েছিলেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত অন্যের একটি লেখা। বন্ধুরা ভেবেছিল লেখাটি তাঁর। ক্রমে গোপাল বেরা জানতে পারলে প্রেমেন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুসুলভ রাগারাগি হাসাহাসির পালা সাঙ্গ হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষক মশাই -এর প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে হরিদাস পন্ডিত মশায়ের কথা। খাতার পাতায় কবিতা লিখতেন প্রেমেন্দ্র আর, চঞ্চলতার জন্য প্রায়ই শাস্তি পেতেন। একদিন পন্ডিতমশাই বাংলা খাতায় 'নৌকাবাওয়া বিষয়ক' কবিতা দেখে তাঁর শাস্তি মকুব করেছিলেন। প্রেমেন্দ্র লিখেছেন 'বাড়ির সামনের আদিগঙ্গায় দিন রাত জোয়ার ভাঁটায় ছোট-বড়-মালতি ডিঙি বজরা ভড়ের যাওয়া আসাই আমার কবিতার প্রথম প্রেরণা দিয়েছিল নিশ্চয়ই।' (পৃঃ ৩০৮, ঐ) এ কবিতায় উল্লেখিত নৌকা, জাহাজ, বন্দর, নাবিক প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যের বিষয় হয়েছে, বিশেষত নোঙর, দাঁড় টানা প্রভৃতি চিত্রকল্প প্রেমেন্দ্র কবিতায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে, প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়বে 'সাগর থেকে ফেরা' নামক কাব্য গ্রন্থটির কথা। কাব্যজীবনের সূচনায় হরিদাস পন্ডিতমশাই প্রচ্ছন্ন সমর্থন প্রেমেন্দ্রের কবি মানসকে উৎসহিত করেছিল। বাংলার শিক্ষক ছিলেন কিরণ মিত্র। সুশ্রী সুবেশ উদার আধুনিক মনের এই ভদ্রলোক ছাত্রদের কাছে আদর্শ ছিলেন। গঙ্গার বান আশা নিয়ে একটি রচনা লেখার জন্য তিনি

প্রেমেন্দ্রসহ কয়েকজন ছাত্রকে স্বচক্ষে সেই বান দেখে আসার জন্য ছুটি দিয়েছিলেন। আর দিয়েছিলেন যাতায়াতের জন্য ট্রাম ভাড়াও । ইতিহাস শিক্ষক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ও অসাধারণ কাহিনি শুনিয়ে ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। কিন্তু এদের সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন সংস্কৃতের শিক্ষক রণেন্দ্রনাথ গুপ্ত। প্রেমেন্দ্রের আত্মকথায় ইনি রনেন পন্ডিত নামে উল্লেখিত । স্কুলের খাতায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা হিমালয় সংক্রান্ত একটি কবিতা দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন তিনি। তাঁর স্নেহদৃষ্টি থেকে প্রেমেন্দ্র কখনোই বঞ্চিত হননি। যদিও রনেন্দ্রনাথের স্নেহদৃষ্টিধন্য কবিতাটি সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র নিজেই খুব বেশী নিঃসংশয় ছিলেন না। প্রেমেন্দ্র লিখেছেন আলোচ্য কবিতাটিতে তিনি কবি দ্বিজেন্দ্রলাল দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'জীবনের প্রথম সচেতন কবিতায়' দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি আকর্ষণের কারণ হিসেবে প্রেমেন্দ্র লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার সারল্য ও প্রত্যক্ষতার কথা। পরবর্তী জীবনে প্রেমেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত কবি হিসাবে এই সহজবোধ্যতা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই গ্রহণ করেছিলেন বিষয় ও সংরূপে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পেছনে এটাই ছিল কারণ। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই সাথেই স্মরণ করেছেন তার প্রধান শিক্ষক দেবকিশোর মুখোপাধ্যায়কে। প্রধান শিক্ষক দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় তাঁর সময়ে অত্যন্ত খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর স্নেহ, শাসন সাউথ সুবার্বাণ এর ছাত্রদের আক্ষরিক অর্থেই অনুপ্রেরণা ছিল। প্রতি বছর ঐ স্কুল থেকে ভালো ফলও হত প্রবেশিকা পরীক্ষায়। প্রেমেন্দ্র পড়াশোনায় যেমন মেধাবী ছিলেন তেমনি ছিলেন অশান্ত প্রকৃতির। এক সহপাঠির সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তার সঙ্গে হাতাহাতিও হয় তাঁর। ছাত্রটি তাঁর বিরুদ্ধে বই ছিঁড়ে ফেলার মিথ্যা অভিযোগ আনে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কাছে। দেবকিশোর বাবু কিন্তু প্রেমেন্দ্রকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে শুধু বলেছিলেন — 'তোমার কাছে এটা আশা করিনি' (ঐ)। শাস্তির বদলে এই স্নেহভর্ৎসনা প্রেমেন্দ্রকে আপ্লুত করেছিল। এরপরেই প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাঁর শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন। প্রধান শিক্ষকের কাছে তাঁর গৃহে স্বতন্ত্রভাবে পাঠও নেন তিনি। আর প্রেমেন্দ্র কলেজে থাকাকালীন তাঁকে আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তাঁর মাতামহী কুমুসকুমারী দেবীকে অনুরোধকরেছিলেন স্বয়ং দেবকিশোর বাবু। প্রেমেন্দ্রকে আমেরিকায় পাঠানোর জন্য আর্থিক ব্যয় সঙ্কুলানের ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। ছাত্রদরদী এই মানুষটি প্রেমেন্দ্রের কাছে ছিলেন আদর্শস্বরূপ।

প্রেমেন্দ্র স্কুলের সহপাঠীদের কথাও স্মরণ করেছেন অনেকবার তাঁর অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে। এদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুও দু'জন আছেন; তারা হলেন — অনাথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়সে বড় হলেও তাঁদের মিশুকে ব্যবহারে একটা সময় প্রেমেন্দ্রের প্রায় সারাক্ষণের সঙ্গী ছিলেন তারা। পরীক্ষা দেবার পক্ষে বয়সটা বেশ কম থাকায় তখনকার প্রথম শ্রেণীতে উঠেও তিন বছর আমায় একই ক্লাসেই আটকে থাকতে। একদিক দিয়ে নিস্ফলা এই তিনটি বছর আমার জীবনের অনেক কিছু ওলটপালট করে দিলেও কোন কোন ব্যাপারে শাপে বর যে হয়েছে সে কথা স্বীকার না করে পারব না (পৃঃ ৩১১, নানা রঙে বোনা) — লিখেছেন প্রেমেন্দ্র। ঐ তিনটে বছর আক্ষরিক অর্থেই উল্লেখযোগ্য । এ সময়েই সাহিত্যসাধনায় তাঁর আনুষ্ঠানিক প্রবেশ। তাঁদের পাড়ায় অনাথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল সাহিত্য বৈঠক, সভা প্রভৃতি। সপ্তাহান্তে সেখানে বিভিন্ন লেখা পাঠ করা হত। এছাড়াও ছিলেন তুলসীমামা ও পাড়ার অন্যান্য অগ্রজেরা। প্রেমেন্দ্রই এই বৈঠকের নাম দেন 'সচল সঙ্ঘ'। সচল সঙ্ঘের উৎসাহদাতা হিসাবে অন্যতম ছিলেন ননীগোপাল মজুমদার। অদ্বিতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিনি শিক্ষনবিশী করেছিলেন; আর ছিলেন সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামা আচার্য নলিনীমোহন শাস্ত্রী, তাঁর নীরব সাহিত্যসাধনা প্রেমেন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল। 'সচল সঙ্ঘ' — এর একটি আসরে 'সবুজ পত্র' পত্রিকার সঙ্গে প্রেমেন্দ্রের পরিচয় ঘটে। সবুজপত্র প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র লিখেছেন প্রমথ চৌধুরী আর 'সবুজপত্র' তাঁদের সাহিত্য ভাবনার জগৎ 'বেশ একটু ওলটপালট করে দিয়েছিল' এবং 'তার ভেতরে একটা উজ্জ্বল প্রাণের স্রোত' 'সবেগে বইছে' - এ উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল। পত্রিকা পাঠের পর প্রেমেন্দ্র ও তাঁর তরুণ বন্ধুদের এসময়েই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা হল শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। পাড়ায় বয়োজ্যেষ্ঠ 'মানুদা' প্রস্তাব দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করার। প্রেমেন্দ্র লিখেছেন সে সময় শরৎচন্দ্রের লেখা নানা মহলে প্রচলিত ছিল এবং ছিল তাঁর জনপ্রিয়তাও। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বহু কষ্টে তাঁদের শরৎচন্দ্রের ঠিকানার নাগাল পেতে হয়েছিল। পরে শিবপুরে প্রাচীন শ্রীহীন একটি জীর্ণ বাড়িতে তাঁরা দেখেছিলেন শরৎচন্দ্রকে। শরৎচন্দ্রের চেয়েও প্রেমেন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল শরৎচন্দ্রের ঘরের পরিবেশটি। সস্তা কাঠের গোলকে রাখা বই, লম্বা দেয়ালে টাঙানো বন্দুক ও তার উপরে রুদ্রাক্ষের

মালা — প্রেমেন্দ্রকে শুধু কৌতুহলী করেছিল তাই নয়, তাঁকে সমকাল সম্পর্কেও যেন সচেতন করেছিল। পরবর্তী কালে সাহিত্যের অন্যতম লেখক হয়ে ওঠার প্রাক্কালে এই ঘটনাগুলি নিঃসন্দেহে প্রেমেন্দ্রের সাহিত্যপথের অণুপ্রেরণা হয়েছিল। 'সচল সঙ্ঘ' -এর সমাপ্তি হয় অনাথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর। এই কাহিনিও করুণ। প্রেমেন্দ্র জানিয়েছেন তাঁর আত্মকথায় যে, সচল সঙ্ঘ -এর বার্ষিক অধিবেশনে প্রচুর বরফ সহযোগে আমপোড়ার সরবত অতি উৎসাহে প্রচুর পান করে নিউমোনিয়া হয় অনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, মাত্র তিন দিনের দিন মারা যান তিনি। অনাথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকস্মিক প্রস্থান, সাহিত্যপথের সূচনায় প্রেমেন্দ্রকে অভিভূত করেছিল।

ইতিমধ্যে স্কুল জীবন শেষ হয়েছে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর; আর সেসময়ে দু তিন জন বন্ধুর কথা বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন প্রেমেন্দ্র। এঁরা হলেন দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, যিনি পরবর্তীকালে অন্যতম ভাস্কর হয়ে উঠবেন, অন্য দুজন স্কুলের ভালোছাত্র — শৈলেন মিত্র ও কান্তি বসাক। সাউথ সুবার্বণ স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন অভিজাত বংশীয় দেবীপ্রসাদ। প্রাণশক্তিতে ভরপুর দেবীপ্রসাদের জীবনে বেদনার কোন স্থান নেই; ফুটবল খেলার দল গড়ে পাড়ার প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে দুঃখিত হন নি দেবীপ্রসাদ। শরীরচর্চা, সাইকেল চালানোর নিপুণতা, বাঁশি বাজানোর দক্ষতা সবমিলিয়ে সহপাঠীদের কাছে দেবীপ্রসাদ ছিলেন প্রবল আকর্ষণীয়। প্রেমেন্দ্র দেবীপ্রসাদের বাড়িতেই দেখেছিলেন প্রথম রাজকীয় অন্দরমহল, আর 'আগাগোড়া কাপড়ে মোড়া পাখির খাচা ঝোলানো' হলঘর; হলঘরটি কেবল পাখি রাখার জন্যই — এই ভাবনা প্রেমেন্দ্রকে অবাক করে দিয়েছিল। সহৃদয় দেবীপ্রসাদ ছবি এঁকে প্রায়ই উপহার দিতেন। প্রেমেন্দ্র লক্ষ করেছেন কৈশোর থেকেই কিভাবে দেবীপ্রসাদের নিজস্ব শিল্পদৃষ্টি বিস্তৃত হয়েছিল — তাঁর ছবির বিষয় হিসেবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপস্থাপিত হত একটি 'কোটরওয়ালা গাছ'। (ঐ) দেবীপ্রসাদের সঙ্গ, ব্যক্তিত্ব প্রেমেন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। প্রেমেন্দ্র লিখেছেন — 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন আমরা নেহাত ছোট ও স্কুলের বেশ নীচের শ্রেণীতে পড়ি। ... ও বয়সে বাইরের বিশালতর জগতের ব্যাপার সম্বন্ধে অজ্ঞ উদাসীন থাকবারই কথা। কিন্তু দেবীপ্রসাদ থাকতে দেয়নি ... সেই প্রথম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালির মত নামগুলির সঙ্গে বাইরের জগতের এই চেহারা আমার কাছে ফুটিয়ে তুলেছে।' (পৃঃ ২১৬, ঐ)।

আর দেবীপ্রসাদ মায়ের স্নেহ ও যত্ন মাতৃহীন প্রেমেন্দ্রকে একটি স্নেহের আশ্রয়ের সন্ধান দিয়েছিল। 'উপনয়ণ' উপন্যাসে বিশুর অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে প্রেমেন্দ্রের এই সময়ের অভিজ্ঞতার কথা। দেবী প্রসাদ যেন বহির্পৃথিবীর মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্রকে; তাই, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিত ও বিশ্ব রাজনীতি ক্রমে দুইই প্রেমেন্দ্রের অভিধ্যানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এছাড়াও প্রেমেন্দ্র লিখেছেন শৈলেন মিত্র ও কান্তি বসাকের কথা। লিখেছেন শৈলেন মিত্রের সঙ্গে সহপাঠি সুলভ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা। শৈলেন মিত্রকে হারিয়ে অনুবাদের ক্লাসে প্রেমেন্দ্রের ট্রান্সলেটিং মেশিন' উপাধি পাওয়া প্রভৃতি কৌতুককর ঘটনা। কিন্তু যে বন্ধুত্বটি দীর্ঘ সময়ব্যাপী এক অচ্ছেদ্যবন্ধনে বেঁধে দেবে দু'জন মানুষকে তা হল অচিন্ত্য সেনগুপ্তের সঙ্গে প্রেমেন্দ্রের বন্ধুত্ব। প্রেমেন্দ্র লিখেছেন যে — ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি দশম শ্রেণীতে উঠলেও বয়স না হওয়ায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে পারেন নি। অচিন্ত্য কুমার পড়তেন ঠিক প্রেমেন্দ্রের নীচের ক্লাসে। দশম শ্রেণী থেকেই তিনি প্রেমেন্দ্রের বন্ধু হয়ে ওঠেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন —

'সাউথ সুবার্বণ স্কুলের ক্লাসে উঠে প্রেমেন্দ্রকে ধরি। ... লক্ষ্য রাখলাম সমস্ত ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল। সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে অসাধারণ, একটি মাত্র ছাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্র, (পৃঃ৫, কল্লোল যুগ)। বন্ধুত্ব ঘনিষ্ট হয়েছে কবিতার প্রতি দুজনের সম আগ্রহে। সমকালের প্রতি সহআদর্শে বিশ্বাসে, সর্বোপরি 'কল্লোল' পত্রিকার ছত্রছায়ায় এসে। সারাজীবনই অক্ষুন্ন ছিল সে বন্ধুত্ব। ইতিমধ্যে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই সম্পূর্ণ মৌলিক একটি উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র। রচনাটির নাম 'পাঁক'। অবশ্য ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তা শেষ হয়নি। পরে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। পাঁক -এর বিষয় ছিল দরিদ্র বস্তিবাসীদের জীবন। এই জনগোষ্ঠী প্রেমেন্দ্রের চোখে দেখা। এদের প্রেমেন্দ্র দেখেছিলেন ভবানীপুরের বাড়ি থেকে সাউথ সুবার্বন স্কুলে যাওয়ার পথে। নোংরা মস্ত পুকুর, চারপাশে নারকেল পাতা, গরীব বস্তি — এই ছিল প্রেমেন্দ্রের চোখে দেখা অভিজ্ঞতার বিষয় যা নামান্তরে সমাজ বাস্তবতা। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দেই প্রথম বিভাগে উচ্চ নম্বর সহ উত্তীর্ণ হন প্রেমেন্দ্র। 'বনস্পতির বৈঠক' -এ প্রবোধকুমার সান্যাল প্রেমেন্দ্রের 'বাংলা জ্ঞান' ও ম্যাট্রিকুলেশনে প্রাপ্ত নম্বর নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন। জবাবি পত্রে প্রেমেন্দ্র যে প্রাপ্ত নম্বরগুলির

উল্লেখ করেছিলেন তাতে প্রেমেন্দ্র যে যথেষ্ট মেধবীছাত্র ছিলেন এবং পরীক্ষায় যথার্থ সাফল্য লাভ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমেন্দ্র প্রথমে ভর্তি হয়েছিলেন স্কটিশচার্চ কলেজের কলা বিভাগে, কিন্তু, অস্থির স্বভাবের প্রেমেন্দ্র প্রায়ই কলেজ ত্যাগ করে যেতেন নির্জনতায়। কখনও চিড়িয়াখানায়, কখনও নদীর ঘাটে। এই সময় থেকেই প্রেমেন্দ্রের মনে কাব্যভাবনার আকর বিস্তৃত হতে থাকে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। প্রেমেন্দ্র তখন স্কটিশচার্চ ছেড়ে ভর্তি হয়েছেন সাউথ সুবার্বণ কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে। দেশব্যাপী তখন তুমুল অস্থিরতা। স্বাধীনতা সংগ্রামের জোয়ার। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল যুগ' বইটিতে বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন এ সময়টির কথা —

'নন কো অপারেশনের বান ডাকা দিন। আমাদের কলেজের দোতলার বারান্দা থেকে দেশবন্ধুর বাড়ির অঙিনা দেখা যায় ... তরঙ্গ তাড়নে কলেজ প্রায় টলোমলো। কি করে যে আঁকড়ে থাকলাম কে জানে শুনলাম প্রেমেন ভেসে পড়েছে' (পৃঃ ২৭)। সেই সময়ে সে বয়সে প্রেমেন্দ্রের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যে অস্থিরতা ও আবেগ যতটা ছিল, দেশচেতনা, কিংবা রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচার মূল্যায়ন ক্ষমতা সম্ভব ছিল না। তাই, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রেমেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিলেন 'আসল চিরন্তন ভারতবর্ষ যেখানে অবহেলায় পড়ে আছে, গ্রামাঞ্চলে সেই চাষীদের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে হবে। তার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা শেখা দরকার।' (পৃঃ ৩২২, নানারঙে বোনা, ঐ)। কৃষিবিদ্যা ও হস্তশিল্প হাতে কলমে শেখার আদর্শ পরিস্থিতি সে সময়ে ছিল শ্রীনিকেতনে। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় প্রেমেন্দ্র চলে গিয়েছিলেন। তবু, শ্রীনিকেতনের তত্ত্বাবধায়ক এলমহার্স্ট প্রেমেন্দ্রের আগ্রহ দেখে তাঁকে ভর্তি করেছিলেন শ্রীনিকেতনে। শ্রীনিকেতন -এর পরিবেশ, শিক্ষাব্যবস্থা সবই ভালো লেগেছিল প্রেমেন্দ্রের। রবীন্দ্রসান্নিধ্য পেয়েছিলেন তিনি; প্রেমেন্দ্র লিখেছেন তাঁর মাস্টারমশায় দেবকিশোর বাবু চেয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র আমেরিকায় যাক। কিন্তু নিজে প্রেমেন্দ্র তা চাননি। তাই তাঁর স্নেহের মর্যাদা তিনি রাখতে পারেননি। কিন্তু শ্রীনিকেতনেও থাকেননি বেশিদিন প্রেমেন্দ্র। এর মূল কারণ কোলকাতার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। কোলকাতায় ফিরে এসে সাউথ সুবার্বন-এ পড়াশোনা

শুরু করলেন প্রেমেন্দ্র। অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে পুরোনো বন্ধুত্ব জোড়া লাগল। কিন্তু, পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারলেন না তিনি। পুরী, মধুপুর নানা অঞ্চলে ভ্রমণ করতে লাগলেন তিনি। বন্ধুদের লিখতে লাগলেন তাঁর অভিজ্ঞতা ও দর্শন এবং ক্রমশ গঠিত হয়ে উঠতে লাগল সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্রের মানস পরিমণ্ডল। প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা যেতে পারে 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার কে লেখা প্রেমেন্দ্রের দীর্ঘ একটি চিঠি — 'কি কথা বলতে চাই বলতে পারছি না। বুকের ভেতর কি কথায় ভিড়, বন্ধ ঘরে মৃগনাভির তীব্র ঘ্রাণের মত নিবিড় হয়ে উঠছে। তবু বলতে পারছি না। কতরকমের কত কথা — তার না পাই খেই, না পাই ফাঁক। হাম্মাহানার বন্ধ কুড়ির মত টনটন করছে সমস্ত প্রাণ — কিন্তু পারছি না বলতে ... গলস্ওয়ার্দির 'Apple Tree' পড়েছিলুম — না পড়ে ফেলেছি দুপুরে, সেই না জানা আপেল মঞ্জরীর সুবাস বুঝি এমন উদাস করেছে। ... Pan ছাড়া এরকম Love Story পড়েছি বলে তো মনে পড়ছে না।' (পৃঃ ১৪, কল্লোল যুগ)।

কিন্তু পরীক্ষার প্রস্তুতি না নিতে পারায় মাতামহী কুসুমকুমারীর সঙ্গে বিরোধ তীব্র হয় প্রেমেন্দ্রের। ব্যক্তিত্বময়ী কুসুমকুমারী ভবানীপুরের বাড়ির বেশ কিছুটা ভাড়া দিয়ে চলে যান কাশীতে। প্রেমেন্দ্র ফিরে এসে উঠলেন ২৮, গোবিন্দ ঘোষাল লেনের একটি মেসে। এই মেস এর দায়িত্বভার ছিল বিমল চন্দ্র ঘোষ ওরফে টেনিদার হাতে। বিমল ঘোষের স্বভাবগত মাধুর্যে প্রেমেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা তৈরী হয়েছিল। অনেকেই মনে করেন প্রেমেন্দ্রের প্রথম গল্পসংকলন 'পঞ্চশর' (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) - এর এক গল্প 'নীপুদা' -র চরিত্রটি টেনিদার আদর্শেই গঠিত। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'আভ্যুদায়িক সংঘ'। এছাড়াও তাদের সঙ্গী ছিলেন শিশিরচন্দ্র বসু, বিনয় চক্রবর্তী, চিত্ত চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন সান্যাল, প্রফুল্ল রায় চৌধুরী প্রমুখ। সব মিলিয়ে জনা দশেক। এই সংঘের বর্ণনা দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে —

'আভ্যুদায়িকের বৈঠক বসত রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। ভালো ঘর পাইনি কিন্তু ভালো সঙ্গ পেয়েছি এতেই সকল অভাব পুষিয়ে যেত।' (পৃঃ ১০, কল্লোল যুগ)। এই আসরটিতে গড়ে উঠল আধুনিক যুগের সাহিত্য ও সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণা। 'মৌচাক' , 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় লেখা ছাপা হত এই সংঘের সভ্যদের। শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল বসু মাঝে মাঝে আসতেন এ সভায়, এখানেই

প্রেমেন্দ্র তাঁর তিন বন্ধু অচিন্ত্যকুমার, শিশিরচন্দ্র বসু ও বিনয় চক্রবর্তীর সঙ্গে একত্রে লেখা শুরু করেছিলেন 'চতুষ্কোণ' নামে একটি উপন্যাস। লেখাটি সম্পূর্ণ হয়নি। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দেই 'আভ্যুদায়িক সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠার আগে বিমল চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র গিয়েছিলেন ঢাকায়। চাঁদপাল ঘাট থেকে নারায়ণগঞ্জ হয়ে ঢাকা পর্যন্ত এই জলপথ যাত্রা তাঁর জীবনের এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা, তাঁর স্মৃতিকথায় প্রেমেন্দ্র লিখেছেন সমুদ্রতীরবর্তী অরণ্য অঞ্চল, নদীর মোহনায় ওঠা প্রবল ঝড়ের অভিজ্ঞতা প্রভৃতির মুগ্ধ বিবরণ।

এই যাত্রাকালীন অভিজ্ঞতার ছবি ধরা পড়েছে প্রেমেন্দ্রের বিভিন্ন সাহিত্যেও যেমন — 'অরণ্যপথ' গল্পটি। 'মহানগর' গল্পসংকলনের অন্তর্ভুক্ত (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ) এটি। আর ঐ জাহাজেই খালাসিদের জীবন অভিজ্ঞতা তিনি দেখেছিলেন দরদী মন নিয়ে। এই জাহাজে এক খালাসির মৃত্যু সংবাদ প্রেমেন্দ্রকে ব্যথিত করেছিল। আমাদের মনে হয় সম্ভবত প্রেমেন্দ্রের বিখ্যাত 'কল্পনায়' গল্পের মালেক চরিত্রটির মূলে এই অভিজ্ঞতাও কাজ করেছিল। ঢাকায় সূত্রপুরের কাগজীটোলার ঘিঞ্জি মধ্যবিত্ত পাড়ায় পুরনো বাড়িতে ঢুকে প্রেমেন্দ্রের 'মুগ্ধ বিস্ময়ে চোখ দুটো যেন বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল' (পৃঃ ৩৩৮, ঐ)। কারণ অন্তত গোটা দশেক সস্তা কাঠের আলমারিতে প্রচুর বই প্রেমেন্দ্রকে আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল। এসময়েই প্রেমেন্দ্র জেনেছিলেন টেনিদার বাবা শ্রী রাধারমণ ঘোষের কথা, লেখাপড়াই ছিল তার প্রথম নেশা। 'সারা জীবনেই সেই বই পত্রের সঞ্চয়ই শুধু তিনি তাঁর পরিবারের জন্য রেখে গিয়েছিলেন' (পৃঃ ৩৩৮, ঐ)। স্বর্গীয় মাতামহ -র সঙ্গে নামসাদৃশ্য ছাড়াও বইয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রেমেন্দ্রকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান করেছিল। ঐ বাড়িটির আকর্ষণ বুকে নিয়ে ফিরে গেলেন মেডিক্যাল স্কুলে পড়ার ইচ্ছা নিয়ে। কিন্তু ঢাকার ছাত্ররা সেখানে অগ্রাধিকার পেত। তাই, অপেক্ষা না করে প্রেমেন্দ্র ভর্তি হলেন ঢাকার জগন্নাথ কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে। থাকতেন অক্সফোর্ড মিশন ছাত্রাবাসে। ঢাকার প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রেমেন্দ্র অনেকটাই মানসিক স্থিরতা ফিরে পেয়েছিলেন। এ সময়ের প্রেমেন্দ্রের চিঠিগুলিতে ধরা পড়েছে রবীন্দ্রপ্রভাব। অন্যদিকে 'আভ্যুদায়িক সঙ্ঘ' প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল তাঁকে। 'আভ্যুদায়িক' -এর একটি শাখা ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগও নিয়েছিলেন। কিন্তু কোলকাতার বন্ধুদের আকর্ষণ এড়িয়ে যেতে পারেননি। তাই, মাঝে

মধ্যেই কোলকাতায় চলে আসতেন প্রেমেন্দ্র, এসে উঠতেন গোবিন্দ ঘোষাল লেনের পুরনো সেই মেসেই। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রেমেন্দ্র এই আসা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মেসের ফাঁকা ঘরে হঠাৎ প্রেমেন্দ্রের হাতে এসে পড়ল ঘরের পুরনো বাসিন্দার নামে লেখা জীর্ণ একটি পোষ্টকার্ড। প্রেমেন্দ্র নিজেই একথা জানিয়েছেন নানা জায়গায়। ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প -এর তিনটি খন্ডের প্রথম খন্ডে প্রেমেন্দ্র মুখবন্ধ হিসাবে জানিয়েছেন — 'আমাদের কামরার দরজা ও জানালার মাথায় যে কাগজে বেশ জমাট করে ঠাসা। আমার মাথার কাছে তেমনি একটি কুলুঙ্গি থেকেই একটা পোষ্টকার্ড কেমন করে আলগা হয়ে খসে পড়েছে নিচে। পোষ্টকার্ডটি কুড়িয়ে নিয়ে বেশ একটু কৌতুকই বোধ করলাম। ... সংসারে অভাব অভিযোগ মেশানো নানা সমস্যার সঙ্গে নিজের আগোচরে মধুর একটি প্রণয়-ব্যাকুলতার আভাস মনকে নাড়া দিয়ে গেল।' (ঐ) এরপরেই 'শূন্য একরঙা ফ্যাকাশে' জীবনের গল্প লিখতে প্রবৃত্ত হন প্রেমেন্দ্র। সেদিনই তৈরী হয়ে ওঠে দুটি গল্প — 'শুধু কেরাণী' ও 'গোপনচারিনী'। গল্পদুটি 'প্রবাসী' পত্রিকার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিয়ে প্রেমেন্দ্র চলে যান ঢাকায়। ঢাকায় বসে অবিশ্বাস্য সংবাদ পান প্রেমেন্দ্র যে গল্পদুটিই 'প্রবাসী'-র পৌষ-মাঘ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। এর আগেও অবশ্য প্রবাসীতে প্রেমেন্দ্রর একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটি ছিল স্পেনীয় লেখক জাসিন্তো বেনাভান্তের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষীয় একটি পরিচিতি জ্ঞাপক রচনা। লেখাটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দেই মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'শুধু কেরাণী' ও 'গোপনচারিণী'। 'শুধু কেরাণী' গল্পের সপ্রশংস সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল এই সময়ের অন্যতম পত্রিকা 'কল্লোল' -এ। নতুন কালের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ সময় প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোল' (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ)। 'শুধু কেরাণী'র সপ্রশংস সমালোচনা করে 'কল্লোল' -এর তৎকালীন সম্পাদক দীনেশ রঞ্জন দাশ সমর্থন জানিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য সম্ভাবনাকে। 'ভারতী' পত্রিকায় এ বছরই প্রকাশিত হয় 'শিকলির দাম' নামে আর একটি ছোটগল্প। আলোচ্য গল্পটিরও প্রশংসাসূচক আলোচনা করা হয় 'কল্লোল' -এ। এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উদ্যোগ ও আগ্রহে প্রেমেন্দ্রের সঙ্গে 'কল্লোল' পত্রিকাগোষ্ঠীর সংযোগ ঘটে যায়। এবং এরপরেই প্রেমেন্দ্রের জীবনে এই নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দেই

জুন মাসে 'কল্লোল' পত্রিকার কার্য্যালয়ে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন প্রেমেন্দ্র। ঐ বছরই 'সংক্রান্তি' নামে একটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয় 'কল্লোল' পত্রিকায়। এ গল্পটিতেও আমরা দেখেছি একটি অসহায় আত্মসমর্পণ রয়েছে সমাজ ও দারিদ্র্যের কাছে। গল্পটিতে কল্লোলীয় আদর্শই বর্ণিত হয়েছিল 'সংহতি পত্রিকা' (১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে)। 'সংহতি পত্রিকা'-র মূল ভাববাদ অপেক্ষাও ছিল সমাজতান্ত্রিক আদর্শ। বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র জ্ঞানাঞ্জন পালের নেতৃত্বে, অমৃতবাজার পত্রিকার মুদ্রণকর্মী জিতেন্দ্রনাথ গুপ্তের উদ্যোগে, ভবানিপুর মিত্র ইনষ্টিটিউশন -এর শিক্ষক মুরলীধর বসুর সহায়তায় সাম্যবাদী ভাবধারাপুষ্ট এই পত্রিকার জন্ম। পত্রিকার সম্পাদনায় যুক্ত ছিলেন মুরলীধর বসু ও জ্ঞানাঞ্জন পাল। মুরলীধর বসু ছিলেন সাহিত্যে নিবেদিত প্রাণ একজন মানুষ। নবীন লেখকের সন্ধানে মুরলীধর সদা তৎপর ছিলেন। তিনি শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্রের লেখা আমন্ত্রণ করেছিলেন। প্রেমেন্দ্রের তখন তৈরী কোন লেখা ছিলনা। তাঁর লেখা 'পাঁক' উপন্যাসটিই কিছুটা সংশোধিত করে পাঠিয়ে দেন তিনি। 'সংহতি' পত্রিকায় 'পাঁক' উপন্যাসটি প্রকাশিত হতে থাকে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই থেকে। কিন্তু ১৯২৪ এর সেপ্টেম্বর মাসের পর 'সংহতি' আর প্রকাশিত হয় নি। তবে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দেই 'বিজলী' পত্রিকায় সম্পূর্ণ হল 'পাঁক' । সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও সুবোধ রায়ের সম্পাদনায় 'বিজলী' পত্রিকাটিও সেই সময়ের একই গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা ছিল। 'পাঁক' উপন্যাসের প্রথম পর্ব এখানেই সমাপ্ত হয়। আর ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে কালিকলম পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'পাঁক' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসেই প্রেমেন্দ্র আবার ঢাকায় ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু অক্সফোর্ড ছাত্রাবাসে খ্রিষ্টান ছাত্রদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী বিতর্কে জড়িয়ে ছাত্রাবাস থেকে বিতাড়িত হন তিনি। এরপর 'বয়েজ হোম' নামে একটি স্বদেশি ছাত্রাবাসে থাকতে শুরু করলেন। বন্ধুত্ব হল অনিল ভট্টাচার্যের সঙ্গে। অনিল ভট্টাচার্যের পিতা গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য ছিলেন ঢাকায় শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সহ অধ্যক্ষ; পরে তিনি বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর প্রেমেন্দ্র এঁদের গৃহে চলে আসেন টিকাটুলিতে। এই পরিবারটির রুচিশীলতা, শিক্ষা প্রেমেন্দ্রের মনকে শান্তি দিয়েছিল। প্রেমেন্দ্র লিখেছেন যে ঢাকার পরিবেশ, নদীবহুল অঞ্চল তাঁকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। শীতলক্ষ্যা নদীর পারে নারায়ণগঞ্জে বেড়াতে যাওয়া, প্রভৃতি স্মরণ

করেছেন প্রেমেন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায়। এসময় প্রেমেন্দ্র নিবিষ্টভাবে পাঠ করেছিলেন বৈষ্ণব কবিতা ও পাশ্চাত্য সাহিত্য। গলস্‌ওয়ার্দি, ইয়েটস্‌ এর সম্পর্কে গভীর অনুভূতির কথা, রবীন্দ্রনাথের কথা প্রেমেন্দ্র এসময়ের লেখা বহু চিঠিতে জানিয়েছেন।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রেমেন্দ্র ফিরে এলেন কোলকাতায়। ঢাকায় আর না ফিরে এক বাল্যবন্ধুর প্রস্তাবে চক্রবেড়িয়া মাইনর স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন। 'কল্লোল' পত্রিকা গোষ্ঠির উষ্ণ সান্নিধ্য, সাহিত্যিক পরিবেশ প্রেমেন্দ্রকে কোলকাতায় তীব্র আকর্ষণে আবদ্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু, ক্রমেই কল্লোল গোষ্ঠীতে ভাঙন দেখা দিল। এই গোষ্ঠী সদস্যরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলেন বিভিন্ন কারণে। নানাকারণে মুরলীধর বসুর সঙ্গে দীনেশ রঞ্জন দাশের মতবিরোধ তুঙ্গে ওঠায় 'কল্লোল' গোষ্ঠীর অনেকেই ঐ পত্রিকা গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে এসে অন্য একটি মাসিক পত্রিকার প্রবর্তন করেন। এই নতুন পত্রিকাটি হল 'কালিকলম'। এর প্রথম প্রকাশ ১৯২৬ খিস্টাব্দ এপ্রিল মাসে। প্রথম বছরে এর সম্পাদক ছিলেন তিনজন — মুরলীধর বসু, শৈলেজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। সাহিত্যগত আদর্শ নয়, 'কল্লোল' গোষ্ঠী ভাঙনের মূল কারণ ছিল ব্যাক্তিত্বের সংঘাত। দীনেশরঞ্জন ও মুরলীধরের ব্যক্তিত্বের সংঘাত তো ছিলই, নতুন লেখকদের অর্থকরী কারণে ক্ষোভও ছিল 'কল্লোল' পত্রিকা সম্পাদক দীনেশ রঞ্জনের উপর — সমালোচক জীবেন্দ্র সিংহরায়েরর এ অনুমান আমরা সমর্থন করি। পত্রিকা সম্পাদনায় প্রেমেন্দ্রের প্রথম আত্মপ্রকাশ 'কালিকলম' পত্রিকায়। এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা বেরিয়েছিল প্রেমেন্দ্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' নামক ছোটগল্পটি। গল্পটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন আরেক লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। 'আমার সাহিত্য জীবন' স্মৃতিকথায় সে কথা স্বীকার করেছেন তারাশঙ্কর। প্রেমেন্দ্র এরপরেই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। কোন এক জায়গায় দীর্ঘদিন মনোনিবেশ করতে পারেন নি। নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থাও ছিল না তাঁর। কলকাতার কাছে রাজগঞ্জে টালিখোলার ব্যবসা, সাঁওতাল পরগণায় বসবাস এবং কাশীর আউধঘরবি ঘাট — এই ছিল তাঁর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের পরিক্রমণ। কাশীতেই তৎকালীন বিদ্বৎসমাজের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন প্রেমেন্দ্র। এবং কাশীতে থাকবেন মনস্থির করে চলে আসেন। গঙ্গার ঘাট, বন্ধুবান্ধব, কারমাইকেল লাইব্রেরি ও বইপত্র নিয়ে ভালোই কাটছিল প্রেমেন্দ্রের দিন। কাশীতেই পরিচয় হয় 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' -র

গবেষক দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র বিনয় সেনের সঙ্গে। ইতিহাস বিশেষজ্ঞ বিনয় সেন প্রেমেন্দ্রকে কোলকাতায় কর্মসংস্থানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে প্রেমেন্দ্র আনন্দসুন্দর ঠাকুর ওরফে বয়োজ্যেষ্ঠ লেখক প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন ঘনিষ্ঠ হয়েছিলন 'উত্তরা' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং সশস্ত্র বিপ্লবীদলের সদস্য সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সুধাংশু মুখোপাধ্যায় ছিলেন শিশির ভাদুড়ীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই গোষ্ঠীতে প্রেমেন্দ্র যোগ দিয়েছিলেন । কিন্তু, কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস নাগাদ কোলকাতায় ফিরে এলেন প্রেমেন্দ্র। এবং এসে উঠলেন 'কল্লোল' পত্রিকার কার্যালয়ে। ইতিমধ্যে 'কালিকলম' পত্রিকার এক বছর পূর্ণ হয়েছে। প্রেমেন্দ্র এসেই 'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করে সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করেছেন। 'কল্লোল' -এর সঙ্গে বিচ্ছেদও প্রেমেন্দ্রকে সম্ভবত পীড়া দিয়েছিল। তাই 'কল্লোল' এর সঙ্গে আবার সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন করেছিলেন প্রেমেন্দ্র। এরপরে ১৯৩৬ বঙ্গাব্দে 'কালিকলম' পত্রিকা অবলুপ্ত হয়। এবং এর আগে প্রেমেন্দ্র এখানে আর লেখেননি, আর 'কল্লোল' পত্রিকার ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রেমেন্দ্র লিখেছিলেন 'কৃত্তিবাস ভদ্র' ছদ্মনামে লঘু প্রবন্ধ, 'মিছিল' উপন্যাস প্রভৃতি। 'কালিকলম' পত্রিকা মূলত কবি হিসেবে প্রেমেন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অবশ্য 'পোনাঘাট পেরিয়ে' বা 'ভবিষ্যতের ভার' -এর মত ছোটগল্প এবং 'পাঁক' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বও 'কালিকলম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'কল্লোল', 'কালিকলম' দুটি পত্রিকার ভূমিকাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যজীবনের সূচনায় অনস্বীকার্য। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কোলকাতায় ফিরে এসে প্রেমেন্দ্র যোগাযোগ করেন বিনয় সেনের সঙ্গে। বিনয় সেন পিতা দীনেশচন্দ্র সেনের সাথে প্রেমেন্দ্রের যোগাযোগ ঘটিয়েছিলেন। প্রেমেন্দ্রকে গবেষণা সহায়কের পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন দীনেশচন্দ্র। সম্মত হয়ে প্রেমেন্দ্র তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -এর উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে দরখাস্ত দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট' -এর কাজে নিযুক্ত হন। কাজ শুরু করার পর দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর গুরু ও পিতৃতুল্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়, কিন্তু প্রেমেন্দ্র তাঁর আগোছালো স্বভাবের জন্য নিয়মিত হাজিরা দিতে পারতেন না। কাজও যথাসময়ে করা সম্ভব হচ্ছিল না তাঁর পক্ষে। ফলে, একবছর কাজের পর তাঁকে গবেষণা সহায়কের পদটি

ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কিন্তু দীনেশচন্দ্র ও বিনয় সেনের প্রীতির সম্পর্ক থেকে তিনি কখনোই বঞ্চিত হন নি। কাশী থেকে ফিরে প্রেমেন্দ্র কল্লোল পত্রিকা কার্যালয়ে কাটিয়ে কিছুদিন পর মহিম হালদার স্ট্রিটে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। কাছাকাছিই থাকতেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার, শৈলজানন্দের বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিবাহ হয় মূলত দিদিমা কুসুমকুমারী দেবীর উদ্যোগে। পাত্রী যশোর জেলার ঝিনাইদহ গ্রামের সতীশচন্দ্র ঘোষের কন্যা বিভাদেবী। সতীশচন্দ্র কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত চাকুরিজীবী ছিলেন। বংশকৌলীন্যেও তারা মিত্র পরিবারের সমতুল্য ছিলেন। বিবাহকালে প্রেমেন্দ্রের বয়য় ছিল পঁচিশ এবং বিভাদেবীর চোদ্দ। বিবাহের পর প্রেমেন্দ্র কাজ নিলেন জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্রিকা 'বাংলার কথা'য়। বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলন তখন তীব্রতর হয়ে উঠেছে। তবে তখন প্রত্যক্ষ রাজনীতির থেকেও মননশীলতায় রাজনীতি পরোক্ষ অথচ স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শগত পত্রিকা প্রকাশের ধূম পড়ে গিয়েছিল। কারাবরণের মেয়াদ শেষ করে বিপ্লবীরা অনেকেই তখন বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেছেন। সেই সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্র। বাংলার রাজনৈতিক মুখপত্র হিসেবে অন্যতম ছিল ইংরাজী 'ফরওয়ার্ড' এবং বাংলায় 'বাংলার কথা' দৈনিক পত্রিকা। এঁদেরই সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল 'আত্মশক্তি'। পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হত 'ফরওয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানী' নামক প্রকাশনা সংস্থা থেকে। 'বাংলার কথা' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। এই পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন সত্যরঞ্জন বক্সী। অল্পদিন পরে সম্পাদক হন গোপাললাল সান্যাল। এরপরে পত্রিকাটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেই প্রেমেন্দ্র মিত্রকে নিয়ে যান বিনয় সেন। — পত্রিকা কার্যালয়, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিটে। 'বাংলার কথা' য় প্রেমেন্দ্র সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। আরও দুজন সহ-সম্পাদক ছিলেন এ পত্রিকার — বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ও সরোজকুমার রায় চৌধুরী। এইভাবে প্রেমেন্দ্র প্রথম সাংবাদিকতার জগতে পা রাখেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বহু ছোটগল্পে আমরা লক্ষ্য করেছি সাংবাদিকতা ও সম্পাদনার ধরণটি। যেমন — 'গল্পে নেই', 'দৌবারিকের দু'কলম' প্রভৃতি গল্প। গল্পগুলিতে এসময়ের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ছাপ রয়ে

গেছে। কিছুদিন পর থেকেই 'বাংলার কথা', 'বঙ্গবাণী' এবং 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা 'লিবার্টি' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। এই নামপরিবর্তনের কারণ স্বরূপ দুটি মত প্রচলিত আছে। প্রথমটি হল, — রাজরোষ এবং দ্বিতীয়টি হল রেল দুর্ঘটনা সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশে রেলওয়ে কোম্পানির সঙ্গে মামলা। দুটি কারণ এক হওয়ার সম্ভাব্যতাও থাকতে পারে। প্রবোধকুমার সান্যালের 'বনস্পতির বৈঠক' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় প্রেমেন্দ্র নামপরিবর্তনের কারণ স্বরূপ রেল দুর্ঘটনার প্রতিবেদন সম্পর্কিত মামলার কথা মেনে নেন। সমালোচক ডঃ সুমিতা চক্রবর্তী অনুমান করেছেন, রেল দুর্ঘটনা সংক্রান্ত মামলাটি সরকারের বিরুদ্ধে মামলা। সে কারণেই রাজ্যরোষ আর তাই পত্রিকা নাম পরিবর্তন। (পৃঃ ৪১ প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুমিতা চক্রবর্ত্তী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি)। যাই হোক 'বাংলার কথা' এবং 'বঙ্গবাণী' দুটিতেই শেষ পর্যন্ত প্রেমেন্দ্র সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের পর ঐ পত্রিকাটিগুলি আর প্রকাশিত হতে পারে নি।

কিন্তু, তখন প্রেমেন্দ্রর আর্থিক উপার্জনের দায় ছিল প্রচুর। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দেই প্রেমেন্দ্র ও বিভার প্রথম সন্তান মাধবীর জন্ম হয়। 'বঙ্গবাণী' সম্পাদনা কালেই প্রেমেন্দ্র যুক্ত হয়েছিলেন সেই সময়ের প্রখ্যাত ঔষধ প্রস্তুতকারক সংস্থা 'বেঙ্গল ইমিউনিটর' বিজ্ঞাপন বিভাগের প্রচার সচিব হিসেবে। বিশ শতকে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ও তাঁর সহযোগী কয়েকজন ডাক্তার মিলে স্থাপন করেছিলেন 'বেঙ্গল ইমিউনিটি'। কিন্তু কর্মব্যস্ত ডাক্তারেরা যথাযথ মন দিতে পারছিলেন না বলে প্রতিষ্ঠানটি কখনোই লাভের মুখ দেখেনি। সংস্থাটি উঠে যাওয়ার মুখে এর হাল ধরেন ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত।নরেন্দ্রনাথ ডাক্তারি পাস করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ক্যাপ্টেন পদাধিকারী চিকিৎসক হয়েছিলেন। রাজনীতি সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল উল্লেখ করার মত। বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের সমর্থক ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। এই সময়েই নরেন্দ্রনাথের সাথে বিধানচন্দ্রের পরিচয়লাভ ও বেঙ্গল ইমিউনিটির দায়িত্বভার গ্রহণ পর্বটি সম্পূর্ণ হয়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ওই সংস্থার বিজ্ঞাপন বিভাগে প্রচারসচিবের কাজ পেলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে শিবরাম চক্রবর্তীর সখ্যও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। 'সাহিত্যসেবক সমিতি'র সঙ্গে সংযোগসূত্রে প্রেমেন্দ্রের রচনার একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে শিবরাম প্রেমেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন। শিবরাম পরবর্তীকালে তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে তাঁদের

সমকালে প্রেমেন্দ্রই যে শ্রেষ্ঠ তা দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করেছিলেন। উভয়ের লেখালেখি উভয়কে প্রভাবিতও করেছিল যথেষ্ট। বিশেষত প্রেমেন্দ্রের অসংখ্য ছোটগল্পে আমরা ক্রমেই লক্ষ করেছি স্পষ্টত হিউমার ও স্যাটায়ারের আবহ হিসেবে তৈরি হয়েছে। বিষয় হিসেবে তাকে গ্রহণ এ ব্যাপারে শিবরামের সখ্য ও প্রভাব অবশ্যই কাজ করে থাকবে। প্রসঙ্গত, 'আদ্যাক্ষর', 'যষ্টিরূপে তমোনাশ', 'বিপদ মানেই বিপবারণ', 'পরোপকার' প্রভৃতি গল্পের সঙ্গে অন্য গল্পগুলিকে মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে গল্পগুলি হিউমার ও স্যাটায়ার ভাবনায় কিভাবে এখানে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। যাইহোক, শিবরাম চক্রবর্তীও 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় কিছুকাল সম্পাদকের কাজ করেছিলেন। কিন্তু স্থায়ী ভাবে কাজ করতে পারেন নি নিজ অস্থির স্বভাবের জন্য। এইখানেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে তাঁর মিল ছিল। শিবরামের জন্য বেঙ্গল ইমিউনিটির প্রচার সচিবের কাজে সুপারিশ করেছিলেন স্বয়ং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। কিন্তু, দশটা পাঁচটার ডিউটি দিতে অনীহা ছিল শিবরামের। আর তাই শিবরাম তাঁর পরিবর্তে কাজটি দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন প্রেমেন্দ্রকে। এতে নরেন্দ্রনাথ রাজী হয়েছিলেন এবং প্রেমেন্দ্র প্রচার সচিব হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু, শিবরামের মতই 'দশটা পাঁচটার' নিয়মিত উপস্থিতির প্রতি অনীহাবশত প্রেমেন্দ্র কাজটা চালিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু, ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিলই। পরে 'বেঙ্গল ইমিউনিটির বিজ্ঞাপন লেখনের কাজে যোগ দেন প্রেমেন্দ্র।

অন্যদিকে, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে প্রেমেন্দ্রের চারটি উপন্যাস 'পাঁক', 'মিছিল', 'আগামীকাল' এবং 'কুয়াশা'। প্রকাশিত হয়েছে গল্পসংকলন গ্রন্থ 'পঞ্চশর' এবং 'বেনামী বন্দর'। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রেমেন্দ্রের প্রথম কবিতা সংকলন 'প্রথমা' প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যেই কবিতা-উপন্যাস-ছোটগল্প তিনটি ক্ষেত্রেই প্রেমেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এরই মাঝে প্রেমেন্দ্র-সাহিত্যে আর একটি দিক উজ্জ্বল হয়ে আছে, সেটি হল প্রেমেন্দ্র রচিত শিশু সাহিত্য। শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত গল্পে প্রেমেন্দ্রের সার্থকতা ও সাফল্যের শুরু ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে। 'দেব সাহিত্য কুটির' প্রকাশনা সংস্থা থেকে ছোটদের জন্য সুদৃশ্য, সুমুদ্রিত, সমৃদ্ধ পূজাবার্ষিকী প্রকাশিত হতে থাকে ১৯৩৭ সাল থেকেই। সমকালের প্রতিষ্ঠিত লেখকরা প্রায় প্রত্যেকেই প্রকাশকদের অনুরোধে এখানে লিখতে

শুরু করেন। প্রেমেন্দ্র এসময়ে যে সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই রীতিমতো সুপ্রতিষ্ঠিত তা উল্লেখ করা হয়েছে। পূজাবার্ষিকীর প্রথম ছোটদের জন্য লেখাতেও তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করলেন। প্রথম প্রকাশিত গল্পটির নাম ছিল 'মশা'। গল্পের নায়ক ঘনশ্যাম। মেসের বাসিন্দা। রীতিমত বাকপটু, বিদেশী ফিক্‌শন্ গল্পের নায়কের ছায়ায় তাকে নির্মাণ করেছিলেন বলে নিজেই জানিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র। (আনন্দমেলা, মে সংখ্যা, ১৯৮৬)। ঘনাদার চরিত্রে অন্যতম সমালোচক সুরজিৎ দাশগুপ্ত দেখেছিলেন ডঃ গোবিন্দ ঘোষাল লেনের বিমলচন্দ্র ঘোষ ওরফে টেনিদার ছায়া। বিষয়টি নিয়ে বিতর্কআছে। যত বিতর্কই থাকুক বাংলায় মজলিসী সাহিত্যের একটি নতুন ঘরানা তৈরী হয়েছিল ঘনাদার আবির্ভাবে। কৃশকায়, শ্যামবর্ণ, চওড়া কপালবিশিষ্ট ঘনাদা বাঙালীর তরুণ শ্রেণীর একসময়ের প্রতিভূস্বরূপ। মেসে তার বাস এবং সঙ্গী ছেলেরাই তার গল্পের শ্রোতা। এই ছেলেরাই তাকে প্রিয় খাদ্য ও অফুরন্ত নেশার দ্রব্যের যোগান দেয় বিনিময়ে অফুরাণ গল্প শোনায় ঘনাদা। তার কাহিনি বিচিত্র, অভিজ্ঞতা বিপুল। তিনি সর্বত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তা প্রমাণে সক্ষম। জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা, সাহস সবই তার পায়ের ভৃত্য — সুতরাং তিনি অতুলনীয়। এই হল ঘনাদার গল্পের সারবত্তা। আর গল্পগুলি মিথ্যা জেনেও তার কথনের আকর্ষণে, রোমাঞ্চকর বর্ণনার টানে মুগ্ধ হয়ে থাকে মেসের ছেলেরা, এবং এভাবেই ছোটবড় নির্বিশেষে গল্প পাঠকের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুও হয়ে ওঠেন ঘনাদা। সর্বোপরি বিজ্ঞান-ফিকশন এত নিপুণভাবে বাংলায় এর আগে পরিবেশিত হয়েছে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রসঙ্গত অবশ্যই মনে পড়বে ত্রৈলোক্যনাথের ডমরুধর এবং প্রমথ চৌধুরীর নীললোহিতের কথা। কিন্তু পূর্বসূরীদের সঙ্গে মিল থাকা সত্ত্বেও প্রেমেন্দ্রের বর্ণনায়, ও সময়নিরিখে ঘনশ্যাম দাস প্রাসঙ্গিক এবং সে কারণেই ঘনাদার গল্পগুলিও মৌলিক। বাংলায় কল্পবিজ্ঞান কাহিনির স্রষ্টার কৃতিত্বও প্রেমেন্দ্র মিত্রেরই প্রাপ্য। ঘনাদার গল্প ছাড়াও এসময় ছোটদের জন্য আরও অসংখ্য রকম গল্প, অ্যাডভেঞ্চার গল্প, ভূতের গল্প, পরাশর বর্মার কাহিনি ও অসংখ্য কবিতা লিখেছেন প্রেমেন্দ্র। অবশ্য, প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম ছোটদের বিষয়ক লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে 'রামধনু' র পাতায়। এর সম্পাদক তখন ছিলেন তরুণ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য। রামধনুর পাতায় প্রথম গল্প ছিল 'সেকালের কথা'। এটিই পরে 'পিঁপড়ে পুরাণ' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে বের হয়েছিল।

এরপরে প্রকাশিত হয়েছিল একে একে 'কালাপানির অতলে', 'ডঃ সরকারের ডায়েরী', 'শয়তানের দ্বীপ', 'হিমালয়ের চূড়ায়', 'পৃথিবীর শত্রু হার্মাদ' প্রভৃতি। অন্যদিকে 'মৌচাক' ও 'রংমশাল' -এর মত নতুন কাগজে বেরিয়েছিল - 'কুসুমের দেশে', 'ময়দানবের দ্বীপ', ' পৃথিবী ছাড়িয়ে' প্রভৃতি উপন্যাস।

অন্যদিকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ তখন লিখছেন, ইংরেজীতে প্রথম সার্থক গদ্য কবিতা 'দ্য চাইল্ড'। আর গদ্যকবিতার সংকলনরূপে 'পুনশ্চ' প্রকাশ পেল ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। প্রেমেন্দ্র মিত্র কিন্তু ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে গদ্যকবিতা লিখছিলেন; যেমন 'পথ', 'মানুষের মানে চাই' প্রভৃতি। এগুলি সমকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় যেমন 'বিজলী' , 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই 'পথ' প্রতীকটি নানাভাবেই প্রেমেন্দ্রের লেখায় বারবার এসেছে। অন্যদিকে, প্রেমেন্দ্রের প্রায় সমকালেই প্রকাশিত হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর 'মর্মবাণী' (১৯২৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'তন্বী' (১৯৩০) জীবনানন্দ দাশের 'ঝরা পালক' (১৯২৭) প্রভৃতি। প্রত্যেকেই এঁরা নিজস্বতা নিয়ে অবির্ভূত হয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আঙ্গিকের অভিনবত্ব, বুদ্ধদেব বসুর রোমান্টিকতা, জীবনানন্দের গভীর অনুধ্যান —এসবের পাশাপাশি 'প্রথমা'র সারল্য এবং পরিচ্ছন্ন বাচনভঙ্গী কবিতা পাঠকদের কাছে সাদরে গৃহীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও প্রশংসা করেছিলেন 'প্রথমা' সংকলনটির । তবে নবীন কবিকে প্রবীনের পরামর্শ ছিল — 'জীবনের যে ভূভাগে মরুর অধিকার পাকা হয়নি, যেখানে ফুল ফোটে, ফল ফলে, সেখানেও কবি বাঁশি বাজাবার বায়না পেয়েছে একথা মনে রেখো— কেবল দুন্দুভি বাজাবার পালা তার নয়।' (পূর্বাশা পত্রিকার রবীন্দ্রসংখ্যা ১৯৪১ এ প্রকাশিত, সুত্র ঃ উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, পিনাকী চৌধুরী)। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাগুলির সত্যতা স্বীকার করেও অসুন্দর জটিল বাস্তবতা, যা আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণ তা যে তাঁকে আকৃষ্ট করেনি তা জানাতে দ্বিধা করেননি। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের জনপ্রিয়তা যে যথেষ্টই ছিল তার একটি প্রমাণ হতে পারে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে রমেশচন্দ্র সেন স্থাপিত 'সাহিত্য সেবক সমিতি'র প্রেমেন্দ্র মিত্রকে দেওয়া সম্বর্ধনা। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্যসেবক সমিতি' দীর্ঘ সময় ধরে বাংলা সাহিত্যিকদের মিলনক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রমেশচন্দ্র সেন নিজেও একজন সমাজমনস্ক সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর সাহিত্যসভায় আসতেন নানা মতাদর্শের সাহিত্যিকরা; পেশায় চিকিৎসক রমেশচন্দ্রের মুক্তারামবাবু

ষ্ট্রিটের চিকিৎসালয় এবং ওষুধের দোকানঘরটিতেই তখন বসত সাহিত্যিকদের আসর। নবীন-প্রবীন অনেকেই এখানে আড্ডায় আসতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল জানা, শিবরাম চক্রবর্তী, বনফুল, মোহিতলাল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস প্রমুখ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের চতুর্থ গল্পসংকলন 'পুতুল ও প্রতিমা' (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ) এবং 'প্রথমা' কবিতা সংকলন প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই উপলক্ষে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন সমালোচক সজনীকান্ত দাস। এর তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। কিন্তু এই ঘটনা থেকে একটা কথা প্রমাণিত হয় — নিন্দা ও প্রশংসা সত্ত্বেও প্রেমেন্দ্র বাংলা আধুনিক কবিতা ও ছোটগল্পের শিল্পীরূপে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন ক্রমশঃ। ছোটগল্পকার হিসেবে তখন প্রেমেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর প্রতিটি ছোটগল্পই স্বমহিমায় সুপরিচিত। হয়ে উঠেছে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রেমেন্দ্রের চারটি গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়েছিল 'পঞ্চশর' (১৯২৯), 'বেনামী বন্দর' (১৯৩০), 'পুতুল ও প্রতিমা' (১৯৩২) এবং 'মৃত্তিকা' (১৯৩৫)। প্রতিটি গল্পসংকলন স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দেই প্রেমেন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী বিভাদেবীর মৃত্যু হয়। মাত্র উনিশ বছর বয়সে মারা যান বিভাদেবী, তিনটি অল্পবয়স্ক সন্তান — মাধবী, মৃন্ময় ও হিরন্ময়কে রেখে। তিনটি শিশু সন্তানকে নিয়ে বিব্রত প্রেমেন্দ্র দ্বিতীয় বিবাহের সিদ্ধান্ত নেন। বন্ধুদের সহায়তায় গিরিডির রাজ এস্টেটের দেওয়ান তিনকড়ি বসুর পৌত্রী, আশুতোষ বসুর কন্যা বীণাদেবীর সঙ্গে বিবাহ হয় তাঁর। মাতৃহীন বিভাদেবীর সন্তানদের বীনাদেবী ছিলেন সত্যিকারের মা। এবং নিজের সন্তান না থাকলেও তাঁর সন্তানস্নেহে ঘাটতি ছিল না। সর্বোপরি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনিয়মিত, অপরিমিত উপার্জনেও সাংসারিক শান্তি বজায় রাখার দায়িত্বভার বীণাদেবীই গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দেই প্রেমেন্দ্র মিত্র যুক্ত হয়েছিলেন সরকারী অনুবাদকর্মের সঙ্গে। সেই উপলক্ষে তৎকালীন সেক্রেটারিয়েট -এ তাঁকে কিছুকাল যাতায়াত করতে হয়েছিল। অনেকেই মনে করেন সেখানকার দীর্ঘ কাঠের সিঁড়ি লক্ষ্য করেই তিনি 'সম্রাট' কাব্য গ্রন্থের 'কাঠের সিঁড়ি' কবিতাটি লিখেছিলেন। ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই প্রেমেন্দ্র ও তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠতা হয় বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর পত্নী প্রতিভা বসুর সঙ্গে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা অক্টোবর প্রকাশিত হয় বুদ্ধদেব বসুর

সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা। এখানে যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কবিতার প্রতি ভালোবাসার টানে পরীক্ষামূলক কবিতার বিষয়-আঙ্গিক ভাবনায় প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর এই পত্রিকাটি । বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে 'কল্লোল' এর সময়কালে ১৯৩০ - '৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রেমেন্দ্রের যে পরিচয় ঘটেছিল তা ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। 'কবিতা' পত্রিকার সূত্রে দুজনের বন্ধুত্ব গভীরতর হয়েছিল। কবিরূপে প্রেমেন্দ্র তখন ছিলেন প্রথিতযশা। বুদ্ধদেবের কবি প্রতিপত্তি নিছক কম ছিল না। 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম রচনাটি ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা 'ইলেকট্রনের তামাশা'। বুদ্ধদেব এভাবেই মর্যাদা দিয়েছিলেন বন্ধুত্বের। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে বুদ্ধদেব-প্রতিভা বসু সহ অনেকের সঙ্গে নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন প্রেমেন্দ্র। কিন্তু, এরপরেই ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদকরূপে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম আর দেখা যায় নি। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে মতবিরোধই এর কারণ কিনা সঠিক বলা যাচ্ছে না, তবে 'কবিতা' পত্রিকার সঙ্গে 'ঘনিষ্ঠ' সংযুক্তি প্রেমেন্দ্রের ছিল না। 'কবিতা' পত্রিকা নিয়ে গবেষণারত গবেষক প্রভাতকুমার দাসকে প্রেমেন্দ্র লিখেছিলেন যে, চলচ্চিত্র মাধ্যমের সঙ্গে সংযুক্তির কারণে তিনি 'কবিতা' পত্রিকার জন্য সময় দিয়ে উঠতে পারেন নি। শুধু এইটুকু ছাড়া বুদ্ধদেব বা প্রেমেন্দ্র কেউই প্রকাশ্যে আর কিছু বলেন নি। প্রভাত কুমার দাসের অনুমান গদ্যকবিতা বিষয়েই তাঁদের মতান্তর হয়েছিল। গদ্যকবিতার আঙ্গিক নিয়ে এই মতপার্থক্যের কারণ অবশ্য ছিলই। কারণ, 'কবিতা' পত্রিকায় যাঁদের কবিতা প্রকাশিত হত তাদের কবিতায় প্রকরণগত জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা প্রায়ই চোখে পড়ত। আবার, কোথাও পাশ্চাত্যের অকারণ অনুকরণও দুর্লভ ছিল না। এজাতীয় জটিলতা ও অন্ধ অনুকরণ প্রেমেন্দ্র মিত্র পছন্দ করতেন না; প্রসঙ্গত, আমাদের মনে পড়বে 'নিরুক্ত' পত্রিকাটি প্রকাশের পূর্বে প্রেমেন্দ্র চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। সেখানে প্রেমেন্দ্র বাংলা কবিতায় 'নকল করা বাতুলতার হুজুগ' কে আক্রমণ করে 'কাব্যাদর্শ' গঠনের কথা বলেছিলেন কবিকে। প্রসঙ্গটি অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে কারণ এখানেই রয়ে গিয়েছে মতাদর্শগত বিরোধের আভাস। অন্যদিকে, আরেকটি সূত্রও চলে আসে পাশাপাশি — 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদনা করছিলেন 'নবশক্তি' পত্রিকা। এ কারণেও হয়ত প্রেমেন্দ্র 'কবিতা' পত্রিকার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন নি। অথচ, 'নবশক্তি' পত্রিকা থেকে তিনি যে উপার্জন করতেন সেটা

তার পক্ষে খুবই জরুরী ছিল। 'নবশক্তি' আসলে ছিল ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের প্রকাশিত 'আত্মশক্তি' পত্রিকারই পরিমার্জিত রূপ। 'নবশক্তি' চিত্তরঞ্জন দাশ পরিচালিত স্বরাজ্য দলের মুখপাত্র হিসাবে নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবী তারানাথ রায়ের সম্পাদনায় 'নবশক্তি' পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ক্রমে পত্রিকাটির আর্থিক সামর্থ ক্ষীণ হয়ে এলে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে এই পত্রিকাটি কিনে নিয়েছিলেন বেঙ্গল ইমিউনিটির ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে থেকে এর সম্পাদক নিযুক্ত হন প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সহকারী সম্পাদক হন অদ্বৈত মল্লবর্মন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত দুই সম্পাদক ও কথাশিল্পীর লেখায় ভরে থাকত কাগজটি। নবীন - প্রবীন দুই ধরনের লেখকই নিয়মিত লিখতেন এখানে। নিয়মিত প্রকাশিত হত একাঙ্ক নাটক। লিখতেন সমকালের প্রতিষ্ঠিত লেখকরা - বুদ্ধদেব বসু, মন্মথ রায়, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখতেন সম্পাদকীয় ও 'বেঙ্গল ইমিউনিটি'র বিজ্ঞাপনী প্রচারসমৃদ্ধ গল্প। যে কোন বিষয়কেই আগ্রহের করে তোলায় প্রেমেন্দ্র ছিলেন সিদ্ধহস্ত; তাই এ ধরনের লেখাও বিশেষত প্রভাব ফেলেছে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত, প্রেমেন্দ্রের বিচিত্র জীবন ও কর্ম অভিজ্ঞতাই তাঁর লেখায় বৈচিত্র্য এনেছে অনেকাংশে, তা অস্বীকার করা যায় না। 'মৌচাক', 'রঙমশাল', 'রামধনু' পত্রিকায় আগেও লিখেছিলেন প্রেমেন্দ্র। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে থেকে 'রঙমশাল' পত্রিকার অন্যতম উপদেষ্টা ও সম্পাদক হয়ে উঠলেন তিনি। পরীক্ষামূলক ভাবনায়, বিচিত্র লেখায় ভরে উঠল 'রঙমশাল' পত্রিকা। এবং এখানের লেখক গোষ্ঠী পারস্পরিক বন্ধুতায় সংযুক্ত ছিলেন দীর্ঘকাল।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। এই সংঘের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মুন্সী প্রেমচন্দ। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রগতি লেখক সংঘের সদস্যরা প্রকাশ করলেন 'টুওয়ার্ডস প্রগ্রেসিভ লিটারেচার' এবং 'প্রগতি' নামে বাংলা ও ইংরাজী দ্বিভাষিক সংকলন। 'প্রগতি' পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কল্পনায়' নামক একটি গল্প। 'প্রগতি লেখক সংঘ' -এর সক্রিয় সদস্য হিসেবে প্রেমেন্দ্র দ্বিতীয় সম্মেলন (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে) -এ যোগ এবং আলোচনা সভায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 'কল্পনায়' গল্পটিতে তাঁর সমকালের একজন দরিদ্র অসহায় মানুষের চিত্র ফুটে উঠতে দেখা গেছে — যে নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত কর্ম ও জীবিকার তাড়নায় তাড়িত,

ব্যক্তিগত জীবন বলে তার কিছু নেই, ভাগ্যের হাতে সে সঁপে দেয় নিজেকে। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত এই বঞ্চনা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। 'মালেক' নামে এই চরিত্রটি যে কল্পিত নয়, সাংবাদিক ও সত্যান্বেষীর দৃষ্টি দিয়ে প্রেমেন্দ্র তা দেখিয়েছিলেন। এর পাশাপাশি এসেছে আরব্য রজনীর একটি কল্পিত প্রেক্ষিত, মুহূর্তেই অবশ্য তা ছিন্ন হয়েছে বাস্তব অভিঘাতে। লেখক সুনিপুণ ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন, শ্রমজীবী মানুষের ট্র্যাজেডি, যা তাদের চরিত্রগত নয়। সমাজের গভীরেই রয়ে গেছে এর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। বোঝা যায় 'প্রগতি' পত্রিকায় 'কল্পনা' য় ছাপা হওয়ার কারণটি। অবশ্য প্রেমেন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক ভাবনার সূত্রপাত আরও আগেই ঘটেছিল ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে 'সংহতি' পত্রিকার সূত্রে। তাঁর 'পাঁক' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'সংহতি' পত্রিকাতেই ধারাবাহিকরূপে। 'সংহতি' র সাম্যবাদী ভাবনা এবং কল্লোলীয় বাস্তবতা দুইই প্রেমেন্দ্রের ভাবাদর্শকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু, কল্লোলীয়রা প্রায়ই ইউরোপীয় বাস্তবতার অন্ধ অনুকরণ করেছেন যা প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনায় প্রভাব ফেললেও ন্যাচারালিজম্ -এর কদর্য অনুপুঙ্খ অনুকরণ গ্রহণ করেননি প্রেমেন্দ্র। তুলনায় 'সংহতি' ও তাঁর সমাজতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন বেশী ঘটেছে প্রেমেন্দ্রের অনেক রচনাতেই। 'পাঁক' উপন্যাসে অবশ্য শ্রমজীবী জনগণের কথা এসেছিল সমাজতন্ত্রবাদী ধারণার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের আগেই ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রেমেন্দ্রের চোদ্দ বছর বয়সে; কিন্তু পাঁক উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব পড়লে বোঝা যায়, সমাজতন্ত্র প্রেমেন্দ্রের মননে ক্রমেই গভীরতম ছাপ ছেলতে শুরু করেছিল। শ্রেণীগত সম্পর্ক, মজুর শ্রেণীর দাবি, সমাজ গঠন, ঔপনিবেশিক শোষণ প্রভৃতির বিশ্লেষণে 'পাঁক' উপন্যাসের দ্বতীয় পর্বে ক্রমশ সাম্যবাদ প্রভৃতির প্রসঙ্গও উপস্থাপিত হয়েছে। 'কল্লোল' সূত্রে ইতিমধ্যেই প্রেমেন্দ্র পরিচিত হয়েছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ও তাঁর সাম্যবাদী ভাবনার সঙ্গে। এ সমস্তই প্রেমেন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

'প্রগতি' র সঙ্গে সংযোগের পর ফ্যাসিবিরোধী সাংস্কৃতিক প্রয়াসের সঙ্গে প্রেমেন্দ্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানির নাৎসিবাহিনি দ্বারা আক্রান্ত হলে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও বুদ্ধিজীবীরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৪১ এর ১৯শে জুলাই বুদ্ধিজীবীদের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল।

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মত প্রেমেন্দ্র মিত্রও। বাংলার ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন বিপুলভাবে আলোড়িত হয়েছিল ঢাকার তরুণ কম্যুনিষ্ট কর্মী সোমেন চন্দের হত্যাকান্ডের পর। ঢাকায় ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ তারিখে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' -র ব্যবস্থাপনায় একটি ফ্যাসি বিরোধী সম্মেলন আহুত হয়। সোমেন চন্দ ছিলেন রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন -এর সম্পাদক। সেই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য মিছিল করে আসার সময় সশস্ত্র রাজনৈতিক দলের আক্রমনে নৃশংসভাবে নিহত হন তিনি। তখন সোমেন চন্দের বয়স মাত্র একুশ, ছোটগল্পকার হিসেবে তিনি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তম গল্প ছিল 'ইঁদুর'। সোমেন চন্দের মৃত্যুর অভিঘাতে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই অভিঘাতেই বাংলায় গঠিত হয় ফ্যাসিবিরোধী 'লেখক ও শিল্পী সংঘ'। দল-মত নির্বিশেষে সাহিত্যসেবীরা যুক্ত হয়েছিলেন এই মঞ্চে। প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথমাবধি যুক্ত ছিলেন এই সংঘের সঙ্গে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে এই সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। এই সম্মেলনে সংঘের নতুন কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। ফ্যাসিবিরোধী কার্যক্রমের অর্ন্তভুক্ত সবগুলি না হলেও বেশিরভাগ গ্রন্থেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা সংকলিত হয়েছে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে 'একসূত্রে' নামক এই সংঘের কবিতা সংকলনে পঞ্চান্নজন কবির মধ্যে ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রও। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে সংঘের প্রবন্ধ সংকলনেও পনেরোজন উল্লেখযোগ্য লেখকের সঙ্গে ছিলেন স্বনামধন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের পরে ইতালী-জার্মানি-জাপান জোটের পরাজয়ের পর ক্রমে এসেছিল ফ্যাসিবিরোধী সংঘের প্রয়োজনীয়তা। 'প্রগতি লেখক সংঘ' থেকে 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ' সর্বত্রই কার্যকরী হয়েছিল প্রেমেন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক বাস্তববোধ। এবং 'সংহতি' পত্রিকার সমাজতান্ত্রিক আদর্শই এর মূল ভিত্তি। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দেও যখন পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ', তখনও প্রৌঢ় প্রেমেন্দ্র তার প্রাদেশিক শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এভাবেই প্রেমেন্দ্রের মানসগঠনে সমাজতন্ত্রবাদ গভীর শিকড় বিস্তার করেছিল। তাই এর বিপুল কর্মকান্ডে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন তিনি বারবার এবং এসবের প্রভাব পড়েছে তার লেখায়।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে চলচ্চিত্র জগতের সংযোগ ঘটে যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের; এই শিল্পরূপের বৈচিত্র্য,

অভিনবত্বের কারণে এটি প্রেমেন্দ্রের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত সতেরো বছর চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন প্রেমেন্দ্র। খুব অল্প বয়সে দাদা মশায়ের সঙ্গে 'ম্যাজিক লন্ঠন' দেখার অভিজ্ঞতা, অ্যাংলো পাড়ায় নির্বাক বায়োস্কোপ দেখা — এ সব প্রয়োগশিল্প তাঁকে চিরকাল আকর্ষণ করেছিল। এই আকর্ষণেই নলহাটিতে 'যাত্রা দেখা' এবং বীরুমামার সঙে কথকতা ও যাত্রার দল তৈরীর কথাও ভেবেছিলেন প্রেমেন্দ্র। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে থেকে যখন কলকাতায় পাকাপাকি বাস করছেন প্রেমেন্দ্র তখন বন্ধুরা যে ম্যাডান থিয়েটার, কিংবা মেট্রোতে নিয়মিত সিনেমা-থিয়েটার দেখতেন তা প্রেমেন্দ্র উল্লেখ করেছেন তাঁর স্মৃতিকথা 'নানা রঙে বোনা' তে। প্রেমেন্দ্রর পূর্বসূরী নজরুল ইসলাম এবং সমবয়স্ক গোকুল নাগ, শৈলজানন্দও চলচ্চিত্র প্রযোজনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু প্রেমেন্দ্রের মতো চলচ্চিত্রের নানা ক্ষেত্রে তাঁরা স্থায়ী হননি দীর্ঘদিন। চলচ্চিত্র প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ রচয়িতা, গীতিকার, কাহিনিকার সবক্ষেত্রেই প্রেমেন্দ্র প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রায় চোদ্দটি ছবি পরিচালনা করেন। চলচ্চিত্রে পরিচালকরূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ সমাধান চলচ্চিত্রের পরিচালনার মধ্যে দিয়ে । 'বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি' 'দাবী' ছায়াছবির জন্য ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রেমেন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার হিসেবে পুরস্কৃত করে ।

'বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি' কর্তৃক পুরস্কৃত হয় তাঁর কাহিনি ও পরিচালনা সমৃদ্ধ 'ভাবীকাল'। চলচ্চিত্র নির্মানশিল্পের প্রয়োগে প্রেমেন্দ্র এনেছিলেন অভিনবত্ব। আলো আঁধারী আবহনির্মাণে প্রেমেন্দ্র সার্থকতা অর্জন করেছেন, রহস্য রোমাঞ্চ প্রধান বাংলা ছায়াছবিতে প্রেমেন্দ্র মিত্র অপ্রতিরোধ্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তৎকালীন বোম্বেতে 'ফিল্মিস্তান' কোম্পানির সঙ্গে তিনবছরের চুক্তিতে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে চিত্রনাট্য লেখার কাজ নিয়ে মুম্বই গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরের বছরই ফিরে আসেন, সম্ভবত সেখানকার পরিবেশে কাজ করার আগ্রহ হারিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র।

চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে সংযুক্তি প্রেমেন্দ্রর সাহিত্যভাবনাকেও প্রভাবিত করেছিল। চিত্রনাট্যের আদলে অনেক ছোটগল্প এসময় লিখেছেন প্রেমেন্দ্র। এসেছে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন আঙ্গিক, নির্মান কৌশল এবং এর সবগুলিই রীতিমতো শিল্প সফল; যেমন — পান্থশালা (১৯৪৭), ইকেবানা

('অষ্টপ্রহর' গল্প সংকলনের অন্তর্গত- ১৯৭৩), কলকাতার আরব্য রজনী ('ক্বচিৎ কখনো' গল্প সংকলনের অন্তর্গত - ১৯৬২)। আবার অনেক গল্প উপন্যাস প্রেমেন্দ্র নিজের তো বটেই, অন্য চলচ্চিত্রকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে প্রেমেন্দ্রের সমসময়ে এবং পরবর্তীকালে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রেমেন্দ্রের গল্প সংকলন গ্রন্থের সংখ্যা পনেরো এবং উপন্যাসের সংখ্যা ষোল। এই পর্বে প্রেমেন্দ্র বেশ কিছু অনুবাদও করেছেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক —প্রতিটি সাহিত্যসংরূপকেই অনুবাদের আওতায় এনেছিলেন তিনি। লরেন্সের গল্প অনুবাদ —সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও ক্ষিতীশ রায়ের সঙ্গে। সমরসেট সম্ এর গল্প অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন, বার্ণার্ড শ এর নাটকও অনুবাদ করেছেন। এসবই প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

প্রেমেন্দ্র প্রথম সাহিত্য পুরস্কার পেলেন ১৯৫৪ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মানিত করা হল ১৯৫৪ সালে, 'শরৎ স্মৃতি পুরস্কার' দিয়ে। আকাশবাণী কলকাতার অনুষ্ঠান-প্রযোজক রূপে তিনি কাজে যোগদান করলেন ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। এবং ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আকাশবাণীতে কাজ করার সময়ও একটি বিশেষ সাহিত্যগোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল যা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, ভারতীয় লেখক, শিল্পী ও সংগীতকারদের সমন্বয়ে গঠিত। এ সময়ে প্রেমেন্দ্রের সহকর্মী ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, সৈয়দ আলী আহমেদ, লীলা মজুমদার প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই প্রেমেন্দ্রের উচ্ছল, সদাপরিহাস প্রিয়, জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। অনুষ্ঠান প্রযোজক রূপেও প্রেমেন্দ্র ছিলেন অনবদ্য। প্রেমেন্দ্রের আগ্রহেই আকাশবাণীর পক্ষ থেকে নবীন সাহিত্যিকরা আমন্ত্রিত হতেন আকাশবাণী ভবনে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রেমেন্দ্র পূর্বাঞ্চলীয় উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দেন আকাশবাণীতে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত এই পদে যুক্ত ছিলেন প্রেমেন্দ্র। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দেই 'সাগর থেকে ফেরা' এই কাব্য সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে 'সাহিত্য অকাদেমী' এবং ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পান প্রেমেন্দ্র ঐ সংকলনের জন্যই। প্রখ্যাত সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য আলোচ্য কাব্যটির প্রসঙ্গে লিখেছেন — 'কবি বাঙালী জীবনের এই সূত্র ভৌগোলিক সীমানাকে পেরিয়ে আবার মহাপৃথিবীর বিশাল আকাশে মুক্তির স্বাদ পেতে চেয়েছেন। সাগর থেকে ফিরে তিনি সঞ্চারিত করে দিতে পেয়েছেন সুবিশাল সমুদ্রচেতনা' (পৃঃ ১৩০, আমার

কালের কয়েকজন কবি, জগদীশ ভট্টাচার্য)। বলাবাহুল্য এ চেতনা সভ্যতার বুকে প্রাণচেতনারই নামান্তর। এর পাশাপাশি ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'ঘনাদা সিরিজ' গল্পমালার জন্য প্রেমেন্দ্র রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পান এবং ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে 'পদ্মশ্রী' সম্মানলাভ করেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দেই প্রেমেন্দ্রের গোয়েন্দা উপন্যাস সংকলন 'পরাশর' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এর আগে 'রোমাঞ্চ' পত্রিকায় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে পরাশর বর্মার গল্প বেরিয়েছিল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে তিনটি পরাশর বর্মার উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রাবন্ধিক রূপে পরিচিত না হলেও তার প্রবন্ধের সংখ্যাও কম নয়। 'কৃত্তিবাস ভদ্র' ছদ্মনামে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন প্রেমেন্দ্র — 'পদবী বিলোপ', 'মুসায়েরা বা কবিসভা প্রভৃতি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য, উক্ত প্রবন্ধগুলি অসংলগ্ন নাম দিয়ে গ্রন্থবদ্ধ হয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। 'বৃষ্টি এল' প্রবন্ধ উনিশটি প্রবন্ধ সংকলনে হয়েছিল। 'বর্বর যুগের পর' (১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে) সংকলন গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছিল দশটি প্রবন্ধ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'কবিতার ছলাকলা' প্রভৃতি। 'বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য' নামে প্রেমেন্দ্র লিখিত জীবনী গ্রন্থটিতে (১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে) পাওয়া যাচ্ছে সাহিত্য-তাত্ত্বিক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। 'শত প্রসঙ্গ' নামে প্রায় অসম্পূর্ণ একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে। প্রেমেন্দ্র লিখিত তাঁর অনবদ্য জীবনীকাহিনী 'নানা রঙে বোনা' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দেই।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রেমেন্দ্র একমাত্র লেখা ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গে ই নিজেকে যুক্ত করেননি। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ করেছেন প্রেমেন্দ্র। শিশুসাহিত্যের জন্য ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে পেয়েছেন 'মৌচাক' পুরস্কার। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান তথ্যবিভাগ আয়োজিত চারদিন ব্যাপী আলোচনাচক্রে পাটনায় আমন্ত্রিত সাহিত্যিক হিসেবে গিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র। আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল 'আমেরিকান সাহিত্য', প্রেমেন্দ্র ছিলেন আমন্ত্রিত বক্তা। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইটার্স কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড' এর অন্যতম ডিরেক্টর নির্বাচিত হন তিনি। ১৯৭১খ্রিস্টাব্দে 'আনন্দবাজার প্রকাশনা সংস্থা'র পক্ষ থেকে 'আনন্দ পুরস্কার' পান প্রেমেন্দ্র। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত দেশ থেকে 'নেহেরু পুরস্কার' লাভ করেন এবং ঐ বছরই

তিনি সর্বভারতীয় 'অথরস্ গিল্ড' এর সভাপতি হন। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে 'হরলাল ঘোষ পদক' এবং ১৯৮১ সালে 'শরৎ সমিতি' থেকে 'শরৎ পুরস্কার' পেয়েছেন প্রেমেন্দ্র। ১৯৮১ তেই পেয়েছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট উপাধি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিনী পদক' তাঁকে প্রদান করা হয় ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিশু সাহিত্যের জন্য তাঁকে 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার' দান করেন। প্রেমেন্দ্রের শেষ সম্মানলাভ ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' উপাধিপ্রাপ্তি। ১৯৬২ সালের পর থেকে প্রেমেন্দ্র একমাত্র সাহিত্যচর্চা ছাড়া অন্য কোন জীবিকার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন নি। শেষ দিকে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল প্রেমেন্দ্রের। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে হারিয়েছিলেন দ্বিতীয় পত্নী বীণাদেবীকে। প্রেমেন্দ্রের জীবনে এ ছিল এক অপূরণীয় ক্ষতি। 'দেশিকোত্তম' উপাধিলাভের পর ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারী 'শিল্প ও সাহিত্য' পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের বাড়িতে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এর পরেই ৪ঠা মার্চ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তিহন প্রেমেন্দ্র এবং ধরা পরে তাঁর ক্যানসার। এই দুরারোগ্য ব্যাধিতেই শেষ পর্যন্ত ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মে মৃত্যু হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের।

জীবনে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা প্রচুর লাভ করেছেন প্রেমেন্দ্র। পুরস্কার বা সম্মান হয়ত শেষ কথা নয়, কিন্তু শিল্প ও শিল্পীকে সম্মানিত করার একটি মাধ্যম তা অস্বীকারও করা যায় না। জীবনের শেষ দিকে প্রেমেন্দ্র বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন। ডিটেকটিভ গল্প, কল্পগাথা, নৃতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক তথ্য সমৃদ্ধ অ্যাডভেঞ্চার — পরাশর বর্মার কাহিনি, (১৯৬০) বা অন্যতম উপন্যাস 'মনুদ্বাদশ' (১৯৬৪) এর স্বাক্ষর। তবে, প্রেমেন্দ্র-সৃষ্ট গোয়েন্দা পরাশর বর্মা খুব বেশী জনপ্রিয়তা পায় নি। এর কারণ সম্ভবত প্রেমেন্দ্রের মজলিশি, থীরচলন। তবে, সেগুলি ব্যর্থও হয়নি। প্রচলিত, গোয়েন্দাদের থেকে স্বতন্ত্র পরাশর বর্মা। সে অলস, কবিতা লিখতে ভালোবাসে, নির্জনতা চায় — কবি ও ডিটেকটিভ এখানে সমন্বিত। আর পরাশরের সহকারী কৃত্তিবাস ওঝা। নামকরণে পুরাণ এবং আদলে বিদেশী ডিটেকটিভ গল্পের প্রভাব এখানে সমন্বয়িত। উপন্যাসের ক্ষেত্রটিও প্রায় বিবর্তিত হয়েছে প্রেমেন্দ্র-জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে বলা যেতে পারে। শেষ দিকের উপন্যাস 'মনুদাদ্বশ' ও 'অমলতাস' (১৯৬৬) প্রভৃতি প্রেমেন্দ্রের পরীক্ষায় নির্মিতিতে, রূপকল্পনায় অসাধারণ হয়ে উঠেছে। ভূ-বিজ্ঞান,

নৃতত্ত্ব, সমাজবিবর্তন মিলিত বৈজ্ঞানিক ফিকশন্ 'মনুদ্বাদশ' এর অন্যতম আকর্ষণ। 'অমলতাস' উপন্যাসে মানবসম্পর্কের জটিল ঘাত-প্রতিঘাত দ্বন্দ্ব উপন্যাসের বিষয় হয়েও আত্মগত দর্শন গল্পটিকে অসাধারণত্ব দিয়েছে। 'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৬) কাব্যগ্রন্থের পর প্রকাশিত হয় 'হরিণ চিতা চিল' (১৯৫৯), 'কখনো মেঘ' (১৯৬১) 'অথবা কিন্নর' এবং 'নদীর নিকটে' (১৯৭২) প্রভৃতি কবিতা সংকলন। এছাড়াও ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (নাভানা প্রকাশনা)। এছাড়া অন্যান্য সংকলনগুলির মধ্যে আছে 'প্রেমের কবিতা' (১৯৭৩), 'ছয় দশকের কবিতা' (১৯৭৮) প্রভৃতি। প্রেমেন্দ্র প্রথম দিকের কবিতা যেমন 'প্রথমা' কিংবা 'সম্রাট' কাব্য সংকলনে আমরা দেখেছি সামাজিক সচেতন মনোভঙ্গি, নিপীড়িত মানুষ, অন্যায়ের প্রতিবাদ মূর্ত হয়েছে উঠেছে। কিন্তু ক্রমে জীবনের অবিরল আনন্দসন্ধানই প্রেমেন্দ্রের কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছিল। নির্জনতা, আত্মসমাহিতি, নিবিড় অনুভূতিতে মগ্ন কবি এখানে অন্তরের সঙ্গে যোগের কথাই ভেবেছেন। 'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৬) কে মাঝখানে রাখলে দুটি সময়ের বিভেদ স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিমানসের বিশেষ লক্ষণ পথিকসত্ত্বা ও প্রেমিক সত্ত্বা, এ দুয়ের সমন্বয়েই প্রেমেন্দ্রের কাব্য অস্তিত্বের পূর্ণতা। প্রেমেন্দ্রকে কবি এলিয়ট নন মুগ্ধ করেছিলেন এজরা পাউন্ড। কিন্তু বিদেশী কবিদের অন্ধ অনুকরণে তাঁর আপত্তি ছিল। অসংখ্য অনুবাদ করেছেন। প্রেমেন্দ্র এবং সবই স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ। ১৯৮২ পর্যন্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প লেখার কথা বলা হলেও, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে গল্পসংকলন নির্বাচিতা বের হওয়ার পর নতুন কোন ছোট গল্প লেখেননি প্রেমেন্দ্র। নাট্যকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা আগেই বলা হয়েছে। 'নবশক্তি' পত্রিকার হয়ে নাট্যসমালোচনা করেছিলেন প্রেমেন্দ্র। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ' নাটকটি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে মঞ্চস্থ হলে এই নাটকের গান লিখেছিলেন প্রেমেন্দ্র। প্রেমেন্দ্রের 'সামনে চড়াই' গল্পসংকলনে 'কালবৈশাখী' নামে ছোট একটি নাটকও মুদ্রিত হয়। প্রেমেন্দ্র লিখেছেন একাধিক নাটক — 'প্রেমই ধন্বন্তরি, (১৯২৯) মলিয়র এর গল্প 'লা মুর মেদিসিন' অবলম্বণে 'হাত বাড়ালেই বন্ধু' (১৯৬২) প্রভৃতি। 'আগন্তুক ' রচিত হয় প্রেমেন্দ্র মিত্র ও তরুণ রায়ের উদ্যোগে। 'পাহারা' (১৯৪৮) নামক পত্রিকায় সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত, দায়িত্বে ছিলেন প্রেমেন্দ্র। পুস্তক প্রকাশকদের সম্মিলিত প্রয়াসে 'বইপত্তর' (১৯৭৩) নামে পত্রিকা দায়িত্ব নেন তিনি।এই সময়েই

'পক্ষীরাজ' নামে একটি ছোটদের পত্রিকা সম্পাদনার কাজ নিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র, জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও এই সম্পাদনা কাজে ব্যপৃত ছিলেন। সম্পাদক হিসেবে প্রেমেন্দ্রে খ্যাতি উল্লেখ করার মতই। একাধিক প্রতিভাধর প্রেমেন্দ্রের জীবন ও কর্মই তাঁর প্রতিভার যথার্থ পরিচায়ক, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।